শিক্ষানীতি : শিকড়ের দিকে এভাবেও তাকানো যায়

শেখর মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধে প্রবেশের মুখেই লেখকের একটি ধারণা জানিয়ে রাখা ভালো। যে-কোনো সময় দলীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সমীকরণের প্রেক্ষাপটে, যে-কোনো নীতি পর্যালোচনা করতে চাইলে, সেই নীতিতে হরেক অভিসন্ধি এবং বিবিধ প্রতিশ্রুতির সন্ধান মিলতে পারে। এমনকি, দাঁতে যে পোকাটি আদপে নেই, সেটিও অনুমিত বা অনুভূত হতে পারে কিংবা, যে পোকাটি আছে সেটির অনস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে। তাতে গবেষকের প্রাথমিক বিশ্লেষণমূলক কাজ বাধা পায় তো বটেই, বিকৃতও হয়ে ওঠে। আমার বিশ্বাস, আপাতত দলীয় রাজনৈতিক তরজা দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের প্রাথমিক কাজ নথি বা দলিল হিসাবে শিক্ষানীতিতে যা বলা হয়েছে তাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে প্রথমে বুঝতে চাওয়া। তাতে ব্যাপক অর্থে রাজনীতি বাদ পড়ে না। সামাজিক জীবনে রাজনীতি থাকে। আমি বলছি সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির কথা। সেটিকে আপাতত দূরে রেখে আলোচনায় নামব। পরে প্রাসঙ্গিকতাবোধে আলোচনায় তাও আসতে পারে।

নতুন শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, কেন্দ্র করে প্রভূত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। হওয়ারই কথা। একটি দেশের উন্নয়ন এবং প্রগতি নির্ভর করে যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের উপরে সেগুলির অন্যতম হল শিক্ষা। নতুন শিক্ষানীতির মূলত দুটি জায়গা নিয়ে মতভেদ আমার গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এক) ত্রিভাষানীতি; দুই) শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য ইতিমধ্যেই 'দেশ' পত্রিকার গত ২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং, এই প্রবন্ধে এগুলি সম্পর্কে বিশদে কিছু বলছি না। এখানে বরং অন্য একটি বা, অন্য একরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও

যে শিক্ষানীতিকে দেখা যায় এবং তার দরকারও আছে সেই কথাটুকুই বলার চেষ্টা করব। তার আগে উপর্যুক্ত দুটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমত, ত্রিভাষানীতি ভারতের প্রতিটি ঘোষিত শিক্ষানীতিতেই থেকেছে। National Policy on Education (NPE) ১৯৬৮ এবং National Policy on Education (NPE) ১৯৮৬, এই দুটি শিক্ষানীতিতেই ইংরেজি ও রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া হিন্দিকে তৃতীয় ভাষা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, এবং তার ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫১তম ধারা। National Education Policy (NEP) ২০২০ কিন্তু তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দির উল্লেখ করছে না। বলছে ইংরেজি ছাড়া পড়াতে হবে ভারতের দুটি ভাষা। তাহলে, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বয়ান দেখার পর তাতে সারা ভারতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি আছে, এমন বলা চলে না। অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে হিন্দি ছাড়াও দুটি ভারতীয় ভাষা যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং দক্ষিণ-ভারত যে কোনোদিনই হিন্দিকে মেনে নেয়নি অর্থাৎ, সেটাও সম্ভব, এই প্রসঙ্গগুলিও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাখাতে ব্যয় বা বিনিয়োগের বিষয়টি নিয়ে যে প্রবল বিতর্ক চলছে সেটিরও বেশিটাই বিভ্রান্তিমূলক। এই বিষয়েও 'দেশ' পত্রিকায় বিশদে আলোচনা করেছি। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা যাক। ১৯৬৪-৬৬ সালে কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদন শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের ৬শতাংশ ব্যয় করার নির্দেশ দেয় এবং স্পষ্ট বলে যে, শিক্ষাখাতে ব্যয় ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যেই জাতীয় আয়ের ৬শতাংশে পৌঁছাতে হবে। ১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতি কোনো সময়সীমা নির্দেশ না করে বলে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য ছোঁয়া যায়নি এবং ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিও একই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-ও শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের সেই ৬ শতাংশেই নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করছে। সময়সীমা এখানেও স্পষ্ট বলা নেই। তাহলে, এই দিক দিয়ে তিনটি নীতির কোনো ফারাক নেই দেখা যাচ্ছে।

এরপর কথা ওঠে, শিক্ষানীতিতে এত যে বড়ো বড়ো কথা বলা হয়েছে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য রাখা হয়েছে, এর টাকা আসবে কোথা থেকে, শিক্ষাখাতে ব্যয় বা বিনিয়োগ করবে কে, সেসব কিছুই বলা নেই। ঠিকই, নেই। কিন্তু, বড়ো বড়ো কথা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যের ঘোষণা ১৯৬৮ এবং ১৯৮৬ সালের নীতি দুটিতে কম কিছু নেই এবং ওই দুটিতেও শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং তার উৎস বলা নেই। তাহলে, এখানেও কোনও তফাত নেই।

এবার আসে শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রসঙ্গ। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির কোথাও বলা নেই শিক্ষার বেসরকারিকরণ ঘটানো হবে। বলা হয়েছে বেসরকারি লোকহিতৈষী সংস্থা (Private Philanthropic Organisation) শিক্ষাক্ষেত্রে আসতে পারে। সে-কথা ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিতেও বলা হয়েছে। তাহলে, এখানেও তফাত নেই।

তবু, সন্দেহ থাকে যে, এই নতুন শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল বাণিজ্যিকীরণ ও বেসরকারিকরণ হবে। কেন? শিক্ষানীতি নামের দলিল বা নথিটিতে তো কোথাও এমন কথা লেখা নেই। বরং, লেখা আছে শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল 'Curbing Commercialization of Education'। বস্তুত, নথিটিতে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে এই নামে। তারপরও সন্দেহ কেন? এখানেই শুরু বিভ্রান্তি। এভাবেই বিভ্রান্তি জন্মায়, কলেবরে বাড়ে। কাজের কাজ কিছু হয় না।

এই বিভ্রান্তি আজকের নয়। এর পুরোনো ঐতিহ্য আছে। এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং ছড়ানোর ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন নেতা, মন্ত্রী, আমলা, ডান-বাম, কংগ্রেস-বিজেপি নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। থেকেথেকেই বলা হয়েছে, কোঠারি কমিশন বলেছেন জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে, কিন্তু এমন তো বলেননি যে, সেই ব্যয় সরকারকেই করতে হবে। তাঁরা অতীতে এমনও দাবি করেছেন যে, সরকারি ও বেসরকারি ব্যয় মিলিয়ে শিক্ষাখাতে দেশের ব্যয় জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ ছাপিয়ে গেছে।

কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ভালো করে খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় এত বিভ্রান্তির কিছু নেই। কমিশন শিক্ষাখাতে ব্যয়ের বিষয়ে যাবতীয় হিসাব কষেছেন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ব্যয়ের ভিত্তিতে। পরিষ্কার বলা আছে সেই হিসাব থেকে যাবতীয় বেসরকারি ব্যয় বাদ রাখা হয়েছে।

নতুন শিক্ষানীতিতে স্বীকার করা হয়েছে যে শিক্ষাখাতে ব্যয় সরকারের দায়িত্ব এবং বর্তমানে এই খাতে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশের অনেক কম ব্যয় করা হয়। এও স্বীকার করা হয়েছে যে, বহু উন্নত দেশের তুলনায় শিক্ষাখাতে আমাদের ব্যয় (সরকারি) মারাত্মক কম। শিক্ষাখাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বে অত্যন্ত পশ্চাদপসর এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। নতুন শিক্ষানীতি সে-কথা স্বীকার করছে।

তবুও বিভ্রান্তি! তাহলে আরও একটু বুঝতে হয়। বুঝতে হয় যে, শুধু আমাদের দেশই নয়, সারা বিশ্বই শিক্ষাখাতে ব্যয় বলতে এই ক্ষেত্রটিতে সরকারি ব্যয়ই বোঝে। সে দেশের নাম আমেরিকা হোক আর আর্জেন্টিনা। বেসরকারি ব্যয়ের হিসাব আলাদা উল্লিখিত হয়। দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশের কিছু বেশি এবং বেসরকারি ব্যয় ২ শতাংশের আশেপাশে। নরওয়েতে এই ব্যয় যথাক্রমে ৬ ও ০.০২ শতাংশ।

অর্থাৎ, বিশ্বে কোথাও শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ বা বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেনি। ভারতে কেন ঘটবে? কোন্ দেশের আদর্শে ভারত এই পথে হাঁটবে? তবে, এ হল গিয়ে ভবিষ্যতের কথা। কে বলতে পারে, আগামীতে কী হবে! কে বলতে পারে, নতুন শিক্ষানীতিতে পরবর্তীকালে কোথাও কোনো মোচড় দেওয়া হবে কি না কিংবা, তার ব্যাখ্যা করা হবে ভিন্নভাবে! তবে, আপাতত শিক্ষানীতি ২০২০ নথিটিতে তার প্রমাণ বা আভাস কিছু নেই।

আচ্ছা, একটু অতীত ও বর্তমান দেখা যাক যার ভিত এখনও অবধি প্রথমে NPE ১৯৬৮ এবং পরে NPE ১৯৮৬। আর্লি চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন (ECCE) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে বিস্তৃত আলোচিত। সরকার এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কী করে দেখতে হবে। কিন্তু, ইতিমধ্যে কী হয়ে বসে আছে? গত কয়েক দশকে অন্তত শহরাঞ্চলে অসংখ্য স্কুল গজিয়ে উঠেছে অনূর্ধ্ব-৬ শিশুদের জন্যে। অভিভাবকেরা এইসব স্কুলে পড়াতে দেদার টাকাও খরচ করছেন। তাহলে, শিক্ষার এই ক্ষেত্রটার শহরাঞ্চলে প্রায় সার্বিক বেসরকারিকরণ হয়ে বসে আছে! কোনো কারণে এই বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলন হয়নি।

সরকারি সূত্রেই জানা যাচ্ছে যে, দেশের ২৬ শতাংশ পড়ুয়া প্রাইভেট কোচিং নেন এবং তাঁদের মাথাপিছু পড়ার খরচের ১২ শতাংশ যায় প্রাইভেট কোচিংয়ে। হিসাব কষলে যে অংক দাঁড়ায় তা আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের স্থূল জাতীয় উৎপাদন (GDP) ছাপিয়ে যায়। এটাও বেসরকারিকরণ। এটাও কারও খেয়াল হয়নি।

একটি গবেষণা জানাচ্ছে, ২০১৩ সালে শুধু এলিমেন্টারি শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থাৎ, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি অবধি, বেসরকারি ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের ২.৫ শতাংশ। এর সঙ্গে পরবর্তী শিক্ষাস্তরগুলিতে বেসরকারি ব্যয় জুড়লে (যে বিষয়ে তথ্য নেই), জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে অঙ্কটা সরকারি ব্যয়ের তুলনায় কম হবে না সম্ভবত। মনে রাখতে হবে, শিক্ষাখাতে বেসরকারি ব্যয়ের মধ্যে বড়ো অংশটাই হল শিক্ষার্থীদের পরিবারের ব্যয়। এই যদি পরিস্থিতি হয় তবে তো শিক্ষাক্ষেত্রের বেসরকারিকণের ব্যাপারে নরওয়ে কেন, আমেরিকাকেও ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে গিয়েছে ভারত। সে-বিষয়ে কোনও বিতর্ক, কোনো আন্দোলন হয়নি। তাহলে, আজ শিক্ষানীতি ২০২০, যেটা এখনও প্রযুক্ত ও পরীক্ষিত নয়, তা নিয়ে কেন এত কথা উঠছে?

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এর বেশিটাই দলীয় রাজনীতির প্রচার এবং তার ফল। কিন্তু, এতে যা ঘটে তা হল সামগ্রিক বিভ্রান্তি। কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তমান শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আছে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ, স্বেচ্ছাচারিতা এবং গণতান্ত্রিক পরিসরকে ক্রমশ সংকুচিত করা। সেটা বড়ো কথা। কিন্তু, ভিন্ন কথা। যে নীতির প্রয়োগ এখনও ঘটেনি তাকে ফলাফল দিয়ে বিচার করার উপায় থাকে না। নীতির বয়ান দিয়েই তাকে বিচার করতে হয়। সেই বিচারে এই নীতিকে অন্তত ত্রিভাষানীতি এবং শিক্ষাখাতে ব্যয় এই দুটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নীতিগুলির তুলনায় বেশি দোষী বলা চলে না।

একটি শিক্ষানীতিকে বিচার করতে হলে আরও কয়েকটি দিকে নজর রাখা উচিত। আমি এটাকেই বলতে চাই অন্য একরকম দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা কমেছে, সাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শিক্ষিতের সংখ্যা। অথচ, পাশাপাশি বেড়েছে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতপাতের দ্বন্দ্ব, দলিত নির্যাতন, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার। অথচ, উলটোটাই তো

প্রত্যাশিত। প্রত্যাশিত ছিল যে, শিক্ষার প্রসারের ফলে এগুলি কমবে। আজকাল রাজনৈতিক নেতা এমনকি, মন্ত্রী পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করেন, ভাষায় যে হিংসাপ্রকাশ করেন তা গত শতকের শেষদিকেও ছিল অকল্পনীয়। গোমাতা, গোময়, গোমূত্র তো বটেই, অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে যে অবৈজ্ঞানিক মতামত অক্লেশে প্রচার করেন সেও অভূতপূর্ব। এটা কীভাবে সম্ভব হল! এ কোন্ শিক্ষার ফল! কোন্ শিক্ষার ফলে একটি দল রামের মন্দির গড়লে, আর একটি দল পত্রপাঠ হনুমানের মন্দির গড়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করে? অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভিত গড়া হতে না হতে, বিজেপির পাল্লা নিতে কংগ্রেসসহ আরও বহু দল রামের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের প্রতিযোগিতা শুরু করল। তাহলে, শিক্ষা এবং শিক্ষানীতি বিষয়ে দলীয় রাজনৈতিক মতামত কোন্ দলের কতটা নির্ভরযোগ্য হতে পারে? আজ হিন্দুত্ববাদী দলগুলি যে উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার করছে, যে কর্মসূচি পালন করছে তার উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে ধর্মের পরিচয়ে দুটি গোষ্ঠীতে বা সম্প্রদায়ে বিভাজন করা। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু। আর একদিকে সংখ্যালঘু মুসলমান। এই কাজ করতে গিয়ে এরা মুসলমান নয় এমন সবাইকেই হিন্দু পরিচিতি দান করতে চাইছে। কিন্তু, ভারতে সমস্ত অমুসলিম মানুষ হিন্দু নন। শুধু খ্রিস্টান, ইহুদি, পার্সি, শিখরা নন, উত্তরপূর্ব ভারতের জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দক্ষিণের রাজ্যগুলি, বস্তুত সারা ভারতেই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ হিন্দু নন। অন্তত, বহুকাল তাঁরা নিজেদের হিন্দু মনে করতেন না। আজও অনেকেই নিজেদের হিন্দু মনে করেন না। কিন্তু, অনেকেই আবার হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেদের হিন্দু বলছেন বা, কেউ তাঁদের হিন্দু বললে মেনে নিচ্ছেন। এসবের শুরু অনেক আগে।

একেবারে প্রাচীনকালে, সেই গুরুকুল প্রথাতেও শিক্ষার অধিকার সকলের ছিল না। একলব্য ইত্যাদি কাহিনি স্মর্তব্য। সেখানেও শিক্ষার অধিকার নির্ণীত হত হিন্দু বর্ণবাদের ভিত্তিতে। ইউরোপীয়রা এদেশে আসার সময় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল ছিল বলেই মনে হয়। হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা সামান্য হত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাই তা করতেন। মুসলমান মৌলানা মৌলবিরা ইসলামি তত্ত্ব এবং আরবি ও ফারসি চর্চা করতেন। তবে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ লেখাপড়া করলে, বেশিরভাগই দরবারি ও সওদাগরি কাজ চালানো গোত্রের বিদ্যাশিক্ষা করতেন। অর্থাৎ, সামান্য ফারসি, আরবি এবং গণিত। ব্রিটিশদের চালু করা শিক্ষানীতি ছিল মূলত মিশনারিধর্মী। মিশনারিদের মিশন ধর্মপ্রচার যেমন হত, বিদেশি শাসকের প্রয়োজনে আমলা ও কেরানি উৎপাদনের 'মিশন'ও সফল হত। স্বাধীনতার পরেও আমাদের দেশের শিক্ষানীতিগুলি একভাবে 'মিশনারিধর্মী'ই রয়ে গেছে মনে হয়। ডিগ্রি আর চাকরি অর্থাৎ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চেতনার বিকাশ এবং মনের প্রসার যা আজও মনে করা হয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, সেটা এই শিক্ষাপদ্ধতি বা, নীতিগুলির মধ্যে উল্লিখিত হলেও, বাস্তবায়িত হতে পায় না। যে শিক্ষানীতি আমাদের দেশে চলে আসছে তাতে সকলের শিক্ষাগ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস এবং তার চেয়েও বেশি ধর্মের ভিত্তিতে জনবিন্যাস ও জাতপাতের বিভাজন। ধর্মীয় জনবিন্যাস এবং জাতপাতের বিভাজনের কারণে যে বৈষম্য তা আবার অনেকটাই প্রতিফলিত হয় অর্থনৈতিক বৈষম্যে। এছাড়া আছে শহর ও গ্রামের বৈষম্য। সর্বোপরি, পুরুষ ও নারীর বৈষম্য।

সাদা চোখেই দেখা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে আজও হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে আছেন মুসলমানেরা। হিন্দুদের মধ্যে আবার সাধারণ বর্ণহিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে আছেন নিম্নবর্গের হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের মধ্যে নিম্নবর্গের মুসলমানরা আছেন পিছনের সারিতে। পিছিয়ে আছেন আদিবাসী জনজাতির মানুষেরা। গ্রামের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে শহর। নারীদের তুলনায় এগিয়ে আছে পুরুষেরা। National Sample Survey Organisation-এর ২০১৪ সালের ৭১তম প্রতিবেদন অনুযায়ী, শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার হার ছিল ৮৬ শতাংশ অথচ গ্রামাঞ্চলে এই হার ৭১ শতাংশ। পুরুষদের সাক্ষরতার হার যেখানে ৮৩ শতাংশ, নারীদের ক্ষেত্রে তা ৬৮ শতাংশ। সারা ভারতে সাধারণ বর্ণহিন্দু ও অন্যান্য অসংরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার প্রায় ৮৫ শতাংশ, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে, তপশিলি জাতিদের মধ্যে এই হার ৬৯ শতাংশ এবং তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে সাক্ষরতার হারে সবার আগে আছেন জৈনরা, তারপর খ্রিস্টানরা, তারপর যথাক্রমে বৌদ্ধ এবং শিখ সম্প্রদায়ের

মানুষেরা। শুধুমাত্র হিন্দুদের সাক্ষরতার হিসাব দেখলে তাঁরা পূর্বোক্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। তাঁদের পিছনে আছেন মুসলমানেরা। আদিবাসীরা সবার চেয়ে পিছিয়ে আছেন। তাঁরা কেউ নিজেদের বলছেন হিন্দু, কেউ কেউ খ্রিস্টান, অনেকেই নিজের ধর্ম নির্দিষ্ট করে বলছেন না বা, বলতে পারছেন না। আলাদা করে কোনো আদিবাসী ধর্মের উল্লেখও সরকারি নথিপত্রে নেই। সেই বিষয়ে আন্দোলনও চলছে। নীচের সারণিটিতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের আনুপাতিক হিসাব দেওয়া গেল।

ভারতে ধর্মীয় সম্প্রদায়

ধর্ম	দেশের মোট জনসংখ্যার শতাংশ
হিন্দু	৮০.৫
মুসলিম	১৩.৪
খ্রিস্টান	২.৩
শিখ	১.৯
বৌদ্ধ	০.৮
জৈন	০.৪
অন্যান্য	০.৬
ধর্ম উল্লেখ করেননি	০.১
তথ্যসূত্র , Census of India ২০১১	

মোটের উপর, ভারতে শিক্ষানীতিগুলি এবং সেগুলির প্রয়োগ যে সর্বত্র এবং সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে ঘটেনি এতে সন্দেহ নেই। এর কারণ হতে পারে দুটি। এক) শিক্ষানীতি সবার কাছে পৌঁছোতে পারেনি; দুই) সবাই শিক্ষানীতিকে সমান আগ্রহে গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয় কারণটি বাস্তবে যতই প্রমাণযোগ্য হোক, প্রথম কারণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রণয়নকারী অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কর্তব্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সেই কর্তব্য পালিত হয়নি। সম্ভবত, খুঁত থেকে গিয়েছে যেমন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে, তেমনই তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ অংশের বাস দেশের সেই সমস্ত রাজ্যে যেগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন এবং নগরায়ণের দিক দিয়ে এগিয়ে আছে। যেমন, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্নাটক, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এই রাজ্যগুলি। এই থেকে একটা অনুমান করা যায় যে, শিক্ষার প্রগতির ক্ষেত্রে বাণিজ্য, শিল্পোন্নয়ন, বাজার অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে এসেছে। ঐতিহাসিকভাবেই, টাকাকড়ি, বাজার, শ্রমবিভাজন এগুলি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো এবং তার গতিকে দ্রুততর করার ক্ষেত্রে বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। অন্যদিকে, খ্রিস্টানদের বাস মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এবং এ ছাড়া গোয়া, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং কেরলে। সেক্ষেত্রে, প্রশ্ন ওঠে, উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর রাজ্যগুলির খ্রিস্টান জনজাতির সাক্ষরতার হারে অগ্রগতির কারণটা কী? উত্তর-পূর্বের খ্রিস্টান জনতা মূলত ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের শিক্ষার জন্য প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বহুলাংশে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার আর্থিক দায়ভারও গ্রহণ করেছেন। মূলত এই কারণেই উত্তর-পূর্বের খ্রিস্টানরা সাক্ষরতায় এগিয়ে যেতে পেরেছেন। সেখানকার জনজাতিগুলির মধ্যে একধরনের সমন্বয়সাধন ঘটেছে এবং বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সকলেই যে জনজাতি, এই পরিচিতির সূত্রে কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। পাশাপাশি, খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মকাণ্ড নতুন কিছু সমস্যাও তৈরি করেছে। কিন্তু, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ব্রিটিশ সরকার যা পারেনি, আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতের জন-নির্বাচিত সরকার যা পেরে ওঠেনি, তার অনেকটাই খ্রিস্টান মিশনারিরা অতীতে সীমিত অঞ্চলে হলেও, করতে পেরেছেন। একথাও মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, খ্রিস্টান মিশনারি ও ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা অনেক ক্ষেত্রে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত তথা স্বার্থগত বিরোধও ছিল। ব্রিটিশ শাসক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সকলের শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং, কোনো কোনো এলাকায় কোনো কোনো সম্প্রদায় শিক্ষার আলো না পেলেই তাঁদের সুবিধে। তাঁরা এদেশে মুনাফা কামাতে এসেছিলেন, সুশাসন দিতে নয়। অন্যদিকে, মিশনারিরা চাইতেন সারা পৃথিবীকে খ্রিস্টান করে তুলতে। সুতরাং, তাঁরা ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সকলের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় জনতাকে সার্বিক শিক্ষাদানের বিষয়টা ইউরোপীয় শাসকেরা দীর্ঘকাল একধরনের বোঝা বিশেষত, আর্থিক ও প্রশাসনিক

বোঝা এবং, অবাঞ্ছিত ও জটিল দায়িত্ব মনে করত। এই কাজের ভার ইউরোপীয় মিশনারিরা নেওয়ার ফলে ইউরোপীয় শাসক নিশ্চিন্ত হয়।

ভারতে বরাবরই বহু ধর্মের অস্তিত্ব থেকেছে। তা ছাড়া, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের উত্থান, আগমন এবং ফলত ধর্মান্তর ঘটেছে। ভারতে ধর্মান্তর বলতে আজ আমরা মূলত বুঝে থাকি হিন্দু ও আদিবাসী ধর্মাবলম্বীর ধর্মান্তর। ধর্মীয় তত্ত্বগত দিক থেকে খ্রিস্ট, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে জাতপাত প্রথার অস্তিত্ব নেই। বাস্তবে, ভারতে এই ধর্মাবলম্বী মানুষেরা জাতপাত প্রথার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারলেও, সেই প্রভাব এঁদের ক্ষেত্রে অনেকটাই কম। শিখ ধর্মতত্ত্বেও জাতপাত প্রথাকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। কিন্তু বাস্তবে, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা জৈনদের তুলনায় এখানে জাতপাতের প্রভাব কিছু বেশি দেখা যায়। কিন্তু, তা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জাতপাত নিয়ে স্পর্শকাতরতার তুলনায় অনেকটাই কম। আগের অনুচ্ছেদগুলিতে প্রদত্ত তথ্য মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, জাতপাত, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদিকে যারা বেশি বর্জন করতে পেরেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তারাই বেশি এগিয়ে যেতে পেরেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়। ধর্মীয় তাত্ত্বিকতায় জাতপাতের উল্লেখ তাঁদের ধর্মে নেই। তবুও বহু শতক দেশ শাসন করার পরও তাঁরা আজও শিক্ষাগত দিক থেকে অন্যদের তুলনায় অনগ্রসর। দারিদ্র-এর একটা কারণ অবশ্যই। আরও কিছু কারণও তাঁদের সামাজিক কাঠামো ও ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থাকতে পারে। একধরনের জাতপাতের ধারণা তাঁদের সমাজেও সম্ভবত আছে। যেমন, আশরাফ ও আজলাফ বা, আতরাফ। আশরাফ বলতে শেখ, সৈয়দ প্রভৃতি উচ্চবর্গরা যাঁদের উৎস বা পূর্বপুরুষের উল্লেখ কোনও-না-কোনওভাবে মধ্য-এশিয়া কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের আরব অঞ্চলের কোনো অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলে। নিম্নবর্গ আজলাফদের মধ্যে আছেন কুঁজরা (সবজি বিক্রেতা), কসাই (মাংস বিক্রেতা), জোলা (তাঁতি), ধুনিয়া (লেপ-তোশক যাঁরা বানান), নায় (ক্ষৌরকার) প্রভৃতি। সম্ভবত, এই কুপ্রথা হিন্দু সমাজেরই প্রভাব। নিম্নবর্গ হিন্দুরাই মূলত ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। উচ্চবর্গ মুসলমানের চোখেও তাঁরা নিম্নবর্গই রয়ে গিয়েছেন। মোটের উপর, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি সমাজে জাতপাতের ধারণার প্রভাবের অনস্তিত্বও শিক্ষায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে আর একটা বড়ো কারণ বলে সাব্যস্ত হয়। অন্যভাবে বললে, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং জাতের বৈষম্য যে-কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত প্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এসে পড়ে লিঙ্গবৈষম্য। নারীদের প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রেও, দেখা যায় জাতপাত প্রথাকে যারা বর্জন করতে পেরেছে, সেসব সম্প্রদায়ের নারীরা অন্য সম্প্রদায়ের নারীদের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি এগিয়ে আসতে পেরেছেন। এরপরও, বলা বাহুল্য, সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায় এবং সাধারণভাবে নারীদের অবস্থান নির্দেশিত দেখা যায় পুরুষদের পিছনে। হিন্দু সমাজে নানান শাস্ত্র ও দেশাচার উল্লেখ করে এবং বহু কুসংস্কারের ভিত্তিতে নারীদের শাসন করার ইতিহাস অতি দীর্ঘ। অনেক উদাহরণই উল্লেখ করা যেতে পারে। গৌরীদান প্রথা অর্থাৎ, শিশুকন্যার বিবাহ। সতীদাহ প্রথার মতো একটা অমানবিক পাশবিক ব্যাপার হিন্দু সমাজে ছিল। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ হওয়ার পরও প্রায় এক শতক যাবৎ ইতস্তত এমন ঘটনা ঘটেছে। ১৯১৩ সালেও সহমরণের ঘটনা সংবাদপত্রে খবর হয়েছে। ১৯৮৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের দেওরালা গ্রামে সতী হন অষ্টাদশী রূপ কানওয়ার। হিন্দু সমাজের একাংশ ঘটনাটিকে এবং রূপ কানওয়ারকে মহিমান্বিত করেছেন। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হলেও, আজও হিন্দু সমাজের বৃহত্তর অংশে বিধবার বিয়ে সহজ চোখে দেখা হয় না। কর্মক্ষেত্রে নারীদের পুরুষদ্বারা নানানভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার নজির হামেশা সংবাদমাধ্যমে মেলে। পর্দাপ্রথা একসময় হিন্দু সমাজে ছিল। আজও তার রেশ রয়ে গেছে। এক নারী রাস্তায় নির্যাতিত হলে, তার পোশাক নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্ন ওঠে তার অবস্থানের স্থান ও কাল নিয়ে। অর্থাৎ, যা বলতে চাওয়া হয় তা হল, নারী কী পরবে, কখন কোথায় যাবে তার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং সমাজ 'বিপথগামী' নারীর বিচার করবে। এটা পর্দাপ্রথারই এক রকমফের। মুসলমান সমাজে পর্দাপ্রথা সম্ভবত আরও কঠোর এবং তা আজও অনেকাংশে রয়ে গেছে। কলকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম নারীদের জন্য এবং কলেজটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'পর্দা কলেজ'। আজ সেই কলেজের নাম লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ। নারীদের প্রতি অনাচারের ইতিবৃত্ত হিন্দু সমাজে একেবারেই দুর্লভ নয়। ভারতীয় মুসলমান সমাজেও নারীর স্থান ভালো বলে মনে হয় না।

দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষায় সমাজে এগিয়ে থেকেছে এবং আছে তারাই এক) যারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল, দুই) যাদের মধ্যে জাতপাতের মাথাব্যথা কম, তিন) যাদের ক্ষেত্রে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীন। এই পর্যবেক্ষণ যেমন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সত্যি, তেমনই সত্যি পরিবার নির্বিশেষে। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সমাজ নির্বিশেষে তুলনায় ধনী পরিবারগুলিতে নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি অগ্রসর এবং তাঁরা অন্যান্য পরিবারের নারীদের তুলনায় বেশি স্বাধীন। হিন্দুসমাজ ও মুসলমান সমাজে এই দিক দিয়ে বিশেষ প্রভেদ নেই। এর অর্থ এই নয় যে, এর ব্যতিক্রম নেই, এ-ও নয় যে, এসব পরিবারে নারী-পুরুষ বৈষম্য নেই।

প্রতিটি শিক্ষানীতিই একটা আদর্শগত অবস্থান ধরে নিয়ে শিক্ষাগত কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি উপর থেকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের উল্লেখ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশ থাকলেও, কোনো শিক্ষানীতিতেই খোলাখুলি শিক্ষার প্রগতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনগত, সামাজিক আচারগত ও পারিবারিক যাপনগত ক্ষেত্রে বাধাগুলির উল্লেখ করা হয়নি এবং ফলত সেগুলি মোকাবিলা করার দিকনির্দেশও নেই। একইভাবে, নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেষ্টাও তেমন চোখে পড়ে না।

এমনটা মোটেও বলতে চাওয়া হচ্ছে না যে, শিক্ষানীতিগুলি কোনোভাবেই ফলপ্রসূ হয়নি বা, দেশের শিক্ষাপরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি বা, কোথাও কোনো সাফল্য পাওয়া যায়নি। সার্বিকভাবে দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটাই এগোতে পেরেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে ১৯৬৮ সাল থেকে দেশে শিক্ষানীতির প্রয়োগ হয়েছে বলেই। বলতে চাওয়া হচ্ছে যে, স্বাধীনতার পর সাতটি দশক এবং প্রথম শিক্ষানীতি চালু হওয়ার পর অর্ধ শতক কেটে যাওয়া সত্ত্বেও, এই দীর্ঘ সময়ে অনেক সমস্যাই রয়ে গেছে। এবং, তা রয়ে গেছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাবনা অসম্পূর্ণ তথা দৃষ্টিভঙ্গি সীমায়িত হওয়ার কারণে।

ব্যাপারটা আরও বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধরা যাক মিড-ডে মিল-এর বিষয়টা। এটা ঠিক যে, মিড-ডে মিল চালু হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে (প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি) গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিয়ো (GER) বেড়েছে এবং দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০০ শতাংশ, কোথাও কোথাও তারও বেশি। ১০০ শতাংশ কিংবা, তার বেশি! তাহলে দেশে যে, ৫ থেকে অনূর্ধ্ব-১৪ এক কোটিরও বেশি শিশুশ্রমিক দেখা যাচ্ছে যারা ওই বয়সি শিশুদের অন্তত চার শতাংশ, তাদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কী? ধরা যাক প্রাথমিক (লোয়ার+আপার প্রাইমারি) শিক্ষাক্ষেত্রে GER গণনা করা হবে। GER নির্ণয় করার সময় দুটি সংখ্যা দেখা হয়। এক, দেশে ৫ থেকে অনূর্ধ্ব-১৪ শিশুদের সংখ্যা কত। দুই, প্রাথমিক ক্ষেত্রে ভরতি হওয়া শিশুর সংখ্যা কত। এবার প্রথমটি দিয়ে দ্বিতীয়টিকে ভাগ করুন। ভাগফল প্রাথমিকে GER। এটা শতাংশের হিসাবে ১০০ বা তার বেশি হতে পারে কারণ, প্রাথমিকে যারা ভর্তি হয়েছে এবং পড়াশোনা করছে তারা সবাই অনূর্ধ্ব-১৪ নয়। অনেকেই বেশি বয়সে পড়া শুরু করেছে। অনেকেই প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোতে না পেরে সেখানেই আটকে আছে। অর্থাৎ, GER গণনায় লব (neumerator) হর (denominator)-এর চেয়ে বেশি। ফলে, ৫ থেকে অনূর্ধ্ব-১৪ এক কোটিরও বেশি শিশু স্কুলে না এলেও, GER অর্থাৎ, স্থূল ভরতি অনুপাত ১০০ শতাংশ বা তার বেশি হতে পারে। তাহলে, স্কুলে মিড-ডে মিল-এর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, এক কোটির উপর শিশু স্কুলে আসছে না। বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। ধরুন, শিশুটি মা-বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করে কিংবা, বাবার সঙ্গে সবজি বেচতে যায় বা চায়ের দোকানে কাজ করে কিংবা, মেয়ে হলে, কোনো মধ্যবিত্তের বাড়িতে সর্বক্ষণের পরিচারিকার কাজ করে। এমনও হয়, মা-বাবা কাজে বেরিয়ে গেলেন, তাঁদের অনুপস্থিতিতে বাড়ির আরও ছোট শিশুদের সামলানোর ভার পড়ল দশ বছরের বালিকাটির উপর। এমনও হয়, ছোট ভাইকে স্কুলে পাঠানো হল, বছর দুইয়ের বড়ো বোন বাড়ি রয়ে গেল মাকে গেরস্থালি বা চাষের কাজ বা জঙ্গলে কাঠ কুড়ানোর কাজে সাহায্য করতে। হয় অনেক কিছুই। এরা মিড-ডে মিলের আকর্ষণেও স্কুলে যেতে পারে না। এই সমস্যার সমাধান চলতি সরকারি শিক্ষাকাঠামোয় সম্ভব নয়।

প্রাথমিকের পর মাধ্যমিক, মাধ্যমিকের পর উচ্চ-মাধ্যমিক, তারপর কলেজ...। সারা দেশে ভরতির হার কমতে থাকে, ভয়ানকভাবে কমতে থাকে। এর কারণ বিবিধ। প্রাথমিকের পর মিড-ডে মিল থাকে না। শিক্ষা অবৈতনিক থাকে না। দশম শ্রেণি থেকে পাস-ফেল প্রথা চালু হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিগত কারণে সন্তানের শিক্ষাগত প্রগতি আশানুরূপ না হলে,

অভিভাবকেরা তাকে অন্য কোনো অর্থকরী কাজে লাগাতে চান বা, তার লেখাপড়ার দায়ভার নিতে পারেন না, অনেকসময় চানও না। কন্যাসন্তান হলে, পনেরো-ষোলো বছর বয়স হল দেখেই অভিভাবকেরা তার বিয়ে দিয়ে 'কন্যাদায়' থেকে মুক্ত হতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দরিদ্র নিম্নবর্গের অনেকেই ভাবেন মেয়ে বেশি লেখাপড়া শিখে ফেললে তার যোগ্য বর জুটবে না বা, জোটাতে বরপণ অনেক বেশি দিতে হবে। আজকাল চিন্তাভাবনা কিছু বদলেছে, সচেতনতাও বেড়েছে। দরিদ্র অভিভাবকেরাও সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করতে চান। কিন্তু, সে এত বেশিও নয় যে, বলা যাবে সার্বিক পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। তাছাড়া, সামর্থ্যের ব্যাপার এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যাও থাকে।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি শিক্ষাগত বৈষম্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতপাতের বৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্য সবগুলিই সরাসরি সম্পর্কিত। অথচ, এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে পারলেই অন্যান্য বৈষম্যগুলি তার প্রভাবেই দূর হয়ে যাবে। এটা ভুল ধারণা। উদাহরণ, মনে করা হয় যে, নারীরা রোজগেরে অর্থাৎ, আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হলেই তাঁরা পিতৃতান্ত্রিকতার বাঁধন ছাড়িয়ে স্বাধীন হবেন, নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচে যাবে। তা কিন্তু হয় না। বৈষম্য হয়তো কিছু কমে, কিন্তু একেবারে নির্মূল হয়ে যায় না। ইন্দিরা গান্ধী তথা কংগ্রেসের 'গরিবি হটাও' স্লোগান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির পরও দেশে দরিদ্রের সংখ্যা আজও দেশের পক্ষে লজ্জাজনক। এইসব কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ আছে। অভিযোগ আছে জাতপাত ও লিঙ্গবৈষম্যের প্রভাবের। আজও, দুর্নীতি ঘটতে দেখলেও মানুষের একটা বড়ো অংশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সফলভাবে প্রতিবাদ করতে পারেন না। পুরুষের হুমকির মুখে নারীরা নিজের কথা বলতে পারেন না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নিজের ভূমিকা মেনে নিয়ে নীরব থাকেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একশো দিনের কাজে অনেকেই ন্যায্য প্রাপ্য পান না। অন্যদিকে, মুষ্টিমেয় কারও কারও দালানবাড়ি উঠে যায়। তাহলে, শুধু রোজগেরে হতে পারলেই সমস্যা মিটে যাবে, এটা ভাবার জায়গা নেই। আজ যেটা ঘটছে, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা তথা পঞ্চায়েতি রাজের ক্ষেত্রেও কর্মপদ্ধতি দাঁড়িয়ে গেছে উপরমহলের নির্দেশ বা প্রতাপে নীচের দিকের মানুষের কাজ। এক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও হয়ে গেছেন উপরমহল। এর অর্থ এই নয় যে, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি কোনো কাজের নয়। যথেষ্টই কাজের। কিন্তু, তার মাত্রা আর জাতপাত-বৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্যের মাত্রা এবং তজ্জনিত কারণে শিক্ষা-বৈষম্যের মাত্রা সরলরেখায় সম্পর্কিত তো নয়ই, একমাত্র সম্পর্কিতও নয়। এই সম্পর্কগুলি বহুমাত্রিক ও বহুস্তরী। সুতরাং, সেভাবেই তার মোকাবিলায় এগোনো প্রয়োজন।

এখানেই চলে আসে ধর্ম এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় বিভেদে সামাজিক রীতিনীতির ভূমিকা। ভারতে সামাজিক সম্প্রদায়গুলি ধর্মের ভিত্তিতেই গঠিত। এ কথা আজ কোনওভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। আজ আমরা যে অতি দক্ষিণ আগ্রাসনবাদী রাজনীতির শিকার, যেভাবে ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনীতি আমাদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করতে, পারলে কেড়ে নিতে উদ্যত, তার মূলে আছে ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের সামাজিক গোষ্ঠীর নির্মাণের ইতিহাস ও সেই নির্মাণের ভিত্তিতে আমাদের পরিচয়। বাঙালি নিজেকে যতই প্রগতিশীল বলুক, পশ্চিমবঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছে। এ কথাও অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ধর্ম এবং জাতপাতের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল। তথাকথিত সেকুলার ও বামপন্থীরাও এর ব্যতিক্রম নন। আজ যখন হিন্দু মৌলবাদ তার দাঁতনখ বের করে নির্দ্বিধায় আগুয়ান তখন কারও মুখ লুকোনোর জায়গা নেই। মুসলিম-তোষণ নামে একটা শব্দবন্ধ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ বোঝা মুশকিল। বোঝা যায় বরং মুসলমানকে নিয়ে রাজনীতি, বোঝা যায় এইটুকুই যে, ভোট পাওয়ার জন্য মুসলিমের বন্ধু সেজেছেন অনেকেই। তাতে মুসলমানের লাভ কিছু হয়নি। সেসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যদি মুসলমানদের সাহায্য করত, আজ মুসলমানেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন পিছিয়ে থাকতেন না। মুসলমানরা ভোটের রাজনীতির শিকার হয়েছেন এবং এর দায় মুসলিম নেতারাও অস্বীকার করতে পারেন না। আজ হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক বিশ্বাস তলানিতে এসে ঠেকেছে। বহু শতক পাশাপাশি বসবাসের পর এ কোনো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা! এই বিভাজনের একশো শতাংশ দায় মৌলবাদী সংগঠন এবং তাদের রাজনীতির উপর চাপিয়ে লাভ নেই। এমন ভান করে লাভ নেই যে, বাবরি মসজিদের চূড়ায় গাঁইতি পড়ার আগে হিন্দু-মুসলমান হরিহরাত্মা বন্ধু ছিল আর মুসলমানরা খুব ভালো অবস্থায় ছিলেন। আমরা যারা সেকুলার

ভালোমানুষ নিরপেক্ষ সাজি তাদেরও আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে। মানুষের প্রশ্ন করার অধিকার আছে যে, দশকের পর দশক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিদান ও তা ভঙ্গের ধারাবাহিকতার পিছনে রহস্যটা কী। কারণ, ভারতে গত কয়েক দশকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটি ভয়ংকর স্পর্শকাতরতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। একে অপরকে ভুল বোঝা আজ সবচেয়ে সহজ।

নিম্নবর্গ হিন্দু ও আদিবাসী জনজাতির শিক্ষা-সমস্যার বিষয়ে আলোচনায় ঢুকলে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়ে যায় না। ইতিপূর্বে মিড-ডে মিল বিষয়ে আলোচনা করেছি। একইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে সংরক্ষণের বিষয়টি। মিড-ডে মিল যেমন প্রয়োজন, সংরক্ষণও প্রয়োজন। কিন্তু, মিড-ডে মিল সত্ত্বেও যে সমস্যা দেখেছি, সংরক্ষণ সত্ত্বেও সেই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তপশিলি জাতি ও বিশেষত তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন ভরতি হয় না। শিক্ষক হিসাবে আমাদের অভিজ্ঞতা একই কথা বলে। অর্থাৎ, তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও, তপশিলি জাতি বিশেষত তপশিলি উপজাতির ছেলেমেয়েরা তার সুযোগ নিতে পারে না। সুযোগ পাওয়া এবং না-পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই যারা সুযোগ নিতে পারে, তাদের মধ্যেও নারী-পুরুষ বৈষম্য থেকে যায়।

নিম্নবর্গ হিন্দুদের দারিদ্র্য ছাড়াও, জাতের উচ্চ-নীচ একটি বড়ো সমস্যা। সংবাদমাধ্যমে বহু অভিযোগ দেখা যায়। মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রেও শোনা যায় বেশকিছু জায়গায় উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। অনাচার নয়! সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি পরিকাঠামো, সরকারি তহবিল, তার মধ্যেও প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং পুষ্ট হচ্ছে জাতপাতের কুপ্রথা। শিক্ষানীতি তো গোড়াতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং প্রায়োগিক স্তরে হীনচরিত্র সাব্যস্ত হল। এর মদত দিচ্ছেন কারা? এলাকার উচ্চবর্ণ সমাজপতিরা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এবং দুঃখের বিষয়, শিক্ষক সম্প্রদায়ও। পচন বললে পচন, বিষবৃক্ষ বললে বিষবৃক্ষ, তার সূচনা তো শুরুতেই দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই আজও শ্রেণিকক্ষে ছাত্র এবং ছাত্রীরা আলাদা বসে। অনেকক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হলে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের আলাদা বসতে নির্দেশও দেন। এ কোন ধরনের শিক্ষা! আজও কো-এডুকেশন ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশে শুধুমাত্র ছাত্র এবং শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম নেই। শুধুমাত্র নারীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজও গড়া হয়ে চলেছে। প্রাথমিকভাবে এর ভালো দিকগুলির পক্ষে কিছু যুক্তি থাকলেও, দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা পশ্চাদপসর বলেই মনে হয়। নারী-পুরুষকে একই সমাজে থাকতে হবে, একই কর্মক্ষেত্রে পাশাপাশি কাজ করতে হবে, পরস্পরকে চিনতে যেমন হবে, সমানাধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতাও হবে। তার শিক্ষা কি প্রাথমিক স্তর থেকেই পাওয়া ভালো নয়? নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিলে একধরনের পর্দাপ্রথাকেই কি সমর্থন করা হয় না? নারীদের প্রকারান্তরে গ্রহান্তরের জীব সাব্যস্ত করা হয় না? শুধু নারী-পুরুষ সমস্যা নয়, শ্রেণিকক্ষে উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণ হিন্দুদের তথা সাধারণভাবে নিম্নবর্গের অবস্থানও সমস্যাজনক হয়ে থাকে। পরিবার দরিদ্র এবং সেই পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছোয় তাদের প্রতি আচরণে উচ্চবর্ণের পড়ুয়াদের তরফে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা প্রকাশ পেতে পারে এবং নিম্নবর্ণের ও বর্গের এই ছাত্রছাত্রীদের মনে কুণ্ঠা ও হীনমন্যতা জন্মাতে পারে। তার জন্য উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের আলাদা আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়লে সমস্যার সমাধান হবে? জাতপাতের অস্তিত্বকেই বৈধতার স্বীকৃতি দেওয়া হবে না? এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ শিক্ষানীতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকসম্প্রদায়কে নিতে হবে। কিন্তু, শুধু এক-আধটা সরকারি নিয়ম বা আইন এক্ষেত্রে তাঁদের সমদৃষ্টি নিতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কারণ, এই সমস্যার বীজ আছে ধর্মভিত্তিক সামাজিক কাঠামোয়।

আমরা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা অনেক শুনেছি। কিন্তু, কোথায় ধর্মনিরপেক্ষতা! বরং, বারংবার দেখা গেছে এবং দেখা যাচ্ছে, সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলির তরফে ধর্মের জমিতে প্রতিযোগিতা। হিন্দুদের সন্তুষ্ট রাখতে তাঁরা মন্দিরে হত্যে দিচ্ছেন, মুসলমানদের খুশি রাখতে মসজিদে গিয়ে দোয়া চাইছেন। এগুলি সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। বস্তুত, এই বিজ্ঞাপনের জন্যই এসব করা। এটা কোন্ প্রকৃতির ধর্মনিরপেক্ষতা বোঝা মুশকিল। তাহলে, যে-সমস্যার বীজ আছে ধর্মে, সেই ধর্মকে সরকার ও রাজনীতি থেকে দূরে না রেখে, তার ভিত্তিতে রাজনীতি হচ্ছে, নির্বাচনে লড়াই হচ্ছে এবং তারই ভিত্তিতে নির্বাচন জিতছেন নেতা-নেত্রীরা। এই রাজনৈতিক দলগুলি, এই নেতানেত্রীবৃন্দ এবং এঁদের গঠিত

সরকার কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে পারেন? বুঝতে অসুবিধে নেই যে, মন্দিরে-মসজিদে যাওয়া জনসংযোগের এক পন্থা। তা বেশ, হিন্দু নেতারা মসজিদে গেলেন, কিন্তু মুসলমান নেতারা সব মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাবেন? তাহলে, হিন্দু নেতারা তাঁদের জনসংযোগের দরুণ হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ভোটই চাইবেন ও পাবেন। কিন্তু, মুসলমান নেতা তো মন্দিরে গিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে পারলেন না। তিনি কি তাহলে শুধু মুসলমানের ভোটের আশায় থাকবেন এবং তাঁদেরই ভোটে জিতবেন? এবং, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় হারবেন? এতে কি মেরুকরণ হয় না! মেরুকরণের সূত্রপাত কি তবে আগেই হয়নি!

আমরা শিক্ষার বিষয়ে কথা বলছি, শিক্ষানীতির বিষয়ে কথা বলছি, আমাদের নেতা-মন্ত্রীরা, আমলারা, শিক্ষকেরা যদি পুজোপাটে সময় কাটান, তিথি-নক্ষত্র দেখে চলেন, সর্বাঙ্গে গ্রহরত্ন ধারণ করেন, তাহলে তাঁদের তৈরি শিক্ষানীতিতে ভরসা করব কীসের ভিত্তিতে! শুধু এঁরাই নন, বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানের অধ্যাপকও আছেন যাঁরা একই পন্থার পন্থী। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই প্রজাতি দুর্লভ নয়। চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, অনেক লেখক-কবি পাবেন যাঁদের হাতের দশ আঙুল রত্নে ভরতি, শ্রীঅঙ্গের বিভিন্ন জায়গা ছেয়ে আছে কবচ-কুণ্ডল-তাবিজ। শিক্ষাপ্রণেতা এবং শিক্ষার কারবারিরা যদি এমন কুসংস্কারের বশ হন, তাঁদের সে কোন্ শিক্ষা? এমন শিক্ষিতদের কাছে কীসের প্রত্যাশা! আগেই দেখেছি, জাতপাতের সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বড়ো সমস্যা। এই সমস্যার ভিত আছে ধর্মে। ধর্মকে কীভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে, অন্তত সরকার-পোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দূরে রাখা যায় সে-বিষয়ে নেতানেত্রী এবং শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের ভাবতে হবে। আমাদের দেশে প্রায় সমস্ত বৈষম্যের মূলে আছে ধর্ম তথা ধর্মভিত্তিক সামাজিক আচার ও আচরণের দস্তুর।

আসা যাক আদিবাসীদের প্রসঙ্গে। আদিবাসী ও হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় আচার ও আচরণে যত মিলই থাকুক, আদিবাসীরা হিন্দু নন। অন্-আদিবাসী সবাইকেই তাঁরা একটা সময়ে 'দেকো' বা 'দিকু' অর্থাৎ, তাঁদের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বহিরাগত জ্ঞান করেছেন। তাঁদের ধর্ম আর হিন্দুদের ধর্মের মিলের পাশাপাশি প্রভেদও রয়েছে বিস্তর। সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিকতায় তো অনেক অমিল। একটা সময়ে হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান, এই তিন ধর্মীয় সম্প্রদায়ই আদিবাসীদের বলেছে বন্য, বর্বর ইত্যাদি।

হিন্দুদের মতো জাতপাত প্রথা আদিবাসীদের মধ্যে নেই। প্রাচীন উৎপত্তি বা, পেশা অনুযায়ী সামাজিক বিন্যাসের আবছা ছাপ কোনো কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকলেও, তা কোনোভাবেই হিন্দু বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় নয়। যেমন, জমসিম বিনতি সাঁওতালদের উৎপত্তির প্রচলিত লোক-ইতিহাস। এখানে সাঁওতালরা হাঁসদা, কিস্কু, মুর্মু ইত্যাদি কয়েকটি গোত্র (sib/sept)-এ বিন্যস্ত। কিন্তু, সেখানে জাতের বা বর্ণের ছোটো-বড়ো বলে কিছু নেই। সাঁওতালরা নিজেদের ধর্মকে বলেন 'সারি ধরম' অর্থাৎ সত্য ধর্ম। সেই অনুযায়ী তাঁরা সাঁওতালদের আরও একটা শ্রেণিবিন্যাস করে থাকেন , সাফা হড়্ অর্থাৎ যাঁরা হিন্দু ধর্মের কিছুটা অনুগামী; উম-হড়্ অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সাঁওতাল; বংগা হড়্ অর্থাৎ যাঁরা সারি ধরম্ বা সনাতন সাঁওতালি ধর্মের অনুগামী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের দারিদ্র্য ছাড়াও একটা বড়ো সমস্যা হল ভাষা। তাঁদের নিজেদের ভাষা আছে। কোনো কোনো ভাষার লিপিও আছে। যেমন, সাঁওতালির অলচিকি। সাঁওতালদের দিয়েই যদি আলোচনা শুরু করি, বিশেষত তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ডে আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সাঁওতালিবা হড়্ পারসি তাঁদের মাতৃভাষা। হড়্ পারসি শব্দবন্ধের অর্থ হল মানুষের ভাষা। সারা ভারতবর্ষেই এমন স্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত যেখানে সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়। অন্যান্য অনেক আদিবাসী ভাষার তা-ও নেই। ফলে, এক আদিবাসী ছাত্রী বা ছাত্র প্রাথমিক স্তরেই এমন একটি ভাষা শিখতে বাধ্য হয় যা তার মাতৃভাষা নয় এবং যে-ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় তেমন নেই বললেই চলে। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ইত্যাদি রাজ্যের ক্ষেত্রে ভাবলে, বাংলা বা হিন্দি যাদের মাতৃভাষা সেই ছাত্রছাত্রীর ইংরেজি শেখার মতোই দাঁড়িয়ে যায় আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর বাংলা বা হিন্দি শেখা। ফলে, বাংলা বা হিন্দি মাতৃভাষা এমন ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় শুরুতেই তারা পিছিয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতির সমাধানের কথা ভাবতে হবে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রতিটি বিষয়ে আদিবাসীদের ভাষায় বই না থাকলে, মাতৃভাষায় পড়াশোনা সম্ভব হবে না। এটা সম্ভবত খুব সহজ কাজ নয়। বরং, নানান কারণে, বেশ জটিল। ধরুন, সাঁওতালদের কথাই যদি ধরি, তাঁদের ভাষায় বই লেখার

লেখক পেতে হবে এবং সেই বই স্কুলে পড়ানোর শিক্ষক পেতে হবে। এখনও পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে আদিবাসীদের যে অবস্থান তার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজটি সহজ নয়। এই বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা ও প্রতিবেদন আছে। উচ্চশিক্ষিত আদিবাসীদের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট কম। তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে মাত্র ১.৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১২.৬ শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষা (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) সম্পূর্ণ করেছেন। তাছাড়া, যাঁরা উচ্চশিক্ষিত তাঁরা সকলে আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ করবেন কিংবা, গ্রামে থেকে আদিবাসী বাচ্চাদের পড়াবেন এমনটাও আশা করা যায় না। এটা একটা অনিবার্য ঘটনা। এটাকে আপওয়ার্ড মোবিলিটি বা উন্নতির পথে উর্ধ্বগামী চলন বলা যায়। এর বিভিন্ন মাত্রার একটি হল গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী পরিযান। ফলে, শহরবাসী শিক্ষিত আদিবাসী তাঁর গ্রামীণ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। তাঁরা আদিবাসীদের সমস্যা তুলে ধরছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্যা সমাধানে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারছেন না।

এই জায়গাটাতে ধর্মের ভূমিকাও খানিকটা এসে পড়ে। যে-কোনো ধর্মের মতোই, আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসেও গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের অনেক জায়গা আছে। ওঝা, জানগুরু প্রভৃতিতে বিশ্বাস, ডাইন ইত্যাদির ধারণা এবং কাউকে ডাইন সাব্যস্ত করে হত্যা করা, সম্প্রদায়ের বাইরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা, আছে এমন বেশ কিছু বিষয়। আদিবাসী শিক্ষিত যুবক-যুবতীর চোখে সেগুলি গোঁড়ামি এবং কুসংস্কার বলে প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, সে বিষয়ে তাঁরা সোচ্চার প্রতিবাদ করতে পারেন না। করলে, একঘরে বা সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আদিবাসী সমাজ এদিক দিয়ে আজও যথেষ্ট আঁটসাঁট। সরকারি প্রশাসন, আইন-কানুন, এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা যথা পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি তাঁদের নিজেদের সনাতন সামাজিক শাসনের বিন্যাস যথেষ্ট গুরুত্ব পায়, হয়তো সরকারি প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের তুলনায় অনেক বেশিই গুরুত্ব পায়। সাঁওতাল সমাজে মাঝি (গ্রামপ্রধান), জগমাঝি (সহকারী গ্রামপ্রধান), নাইকে (পুরোহিত), গডেৎ (গ্রামদূত), পির পারাগানা (একাধিক গ্রাম মিলে একটি এলাকার প্রধান), দিশম পারগানা (সারা দেশের সমস্ত মিলিত সাঁওতাল জনপদের প্রধান) প্রমুখদের নিয়ে যে চিরাচরিত সামাজিক শাসন ও ধর্মীয় অনুশাসন ব্যবস্থা, তার আবেদন গ্রামীণ ও অরণ্যবাসী সাঁওতালদের কাছে অনেক বেশি। সাধারণত, মাঝি, জগমাঝি প্রভৃতি পদগুলি বংশানুক্রমিক। অন্যদিকে পঞ্চায়েতি রাজ প্রথায় পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য প্রভৃতি পদগুলি নির্বাচনসাপেক্ষ। এমনটাই মনে করা হয় যে, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা পঞ্চায়েতের প্রধান বা সদস্য তাঁরা সরকারি তরফে এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও সেচের ব্যবস্থা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প রূপায়ণ করা ইত্যাদি ব্যাপার দেখবেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নেই। সেই ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব মাঝি, জগমাঝি, নাইকে প্রমুখের। সুতরাং, সাঁওতাল সমাজে মূল ক্ষমতার অধিকারী মাঝি, জগমাঝি, নাইকে প্রমুখরাই। আর্থিক সচ্ছলতা-অসচ্ছলতার নিরিখে এই মাঝি, জগমাঝি, নাইকে প্রমুখেরা গ্রামের আর পাঁচজনের মতোই সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল। এঁরা অনেকেই নিজের সামান্য জমিতে কাজ করেন, অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করেন, একশো দিনের কাজে খাটতে যান ইত্যাদি। কিন্তু, সামাজিক অনুষ্ঠান, সামাজিক বিচারের আসরে এঁরা মান্যগণ্য প্রতাপশালী ব্যক্তি। অন্যদিকে, ইদানীংকালের ধারামাফিক, নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানরা তুলনায় আর্থিকভাবে সচ্ছল। কিন্তু, সামাজিক কাজেকর্মে তাঁদের নিদান দেওয়ার অধিকার নেই। থাকলে, তাতে ভালো কি মন্দ হত, সে বলা খুব মুশকিল। কিন্তু, এর ফলে যেটা ঘটছে, সরকারি নীতি এবং বাস্তবে তার প্রয়োগ, এই দুইয়ের মধ্যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। পাশাপাশি, আদিবাসী শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় এবং আদিবাসী গ্রামসমাজের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। শিক্ষিতরা অনেক প্রাচীন প্রথাই সমর্থন করেন না। কিন্তু, এ-বিষয়ে সমাজে খুব কিছু বলতেও পারেন না। ফলে, সনাতন সামাজিক কাঠামো ও প্রথার সঙ্গে একধরনের নীরব দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয় জ্ঞান করছেন। দূরত্ব এমনিতেও গড়ে উঠছে। বস্তুত, আজকালকার আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা বেশিরভাগই তাঁদের সামাজিক বিভিন্ন প্রথা, পুরাণকাহিনি যেমন বিনতিগুলি, উপাস্য দেবদেবী তথা বংগা বা বুরু, এমনকি জাহের এবং জাহের-এর অধিষ্ঠাতা-অধিষ্ঠাত্রীদের বিষয়ে তেমন খবর রাখেন না। এর কতকগুলি দুঃখজনক দিক আছে। শিক্ষিত মন যুক্তি দিয়ে কোনো কিছুকে কুসংস্কার বলে বুঝলে, তার প্রতিবাদ করা ভালো, ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করা ভালো, কেউ চাইলে ধর্ম অস্বীকারও করতে পারেন, পুরোপুরি নাস্তিকও বনে যেতে পারেন, নিজের নিজের রুচি। কিন্তু, নিজের ইতিহাস এবং নিজের সমাজের

বিবর্তনকে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করাটা ভালো বলা যায় না। সেটা নিজেকেই হারিয়ে ফেলা। এই আত্মবিস্মৃতি কাম্য নয়। নিজের সামাজিক অতীতে ভালোর পাশাপাশি মন্দও থাকেই, সেটুকু জানা এবং বোঝাই আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, আমি পরিচিতিতে হিন্দু হয়েও এই ধর্মের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিতে পারি, নাস্তিকও হতে পারি, কিন্তু এই ধর্মভিত্তিক সামাজিকতাতেই আছে আমার অতীত পরিচয়। তাকে অস্বীকার করলে হিন্দুধর্ম-ভিত্তিক সমাজে যে কুসংস্কার, যে পচন, যে মৌলবাদের জায়গা আছে তার বিষয়ে কিছু করা তো দূরের কথা, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও সামিল হতে পারি না। এমনকি নাস্তিক হলেও, এ বিষয়ে কথা বলার অধিকার আমার আছে, কিন্তু তখনই আছে, যখন আমি এই সমাজকে চিনি, এর বিবর্তনের ইতিবৃত্ত জানি এবং এই সমাজের মধ্যেই আছি। ধর্মীয়-ধর্মহীন 'মানুষের ধর্ম'-এর পরিচয়ে উন্নীত হওয়ার এটাই রাস্তা। নইলে, আমি বেরিয়ে এলাম এই সমাজ থেকে, কিন্তু আরও বহু মানুষ রয়ে গেল ধর্মভিত্তিক সামাজিক পচনের মধ্যে। এই পচন একদিন আমাকেও আহত করবে।

আদিবাসী সমাজের শিক্ষিত মানুষজনদের একা দোষ দিয়ে লাভ নেই, সমাজেরও দায়িত্ব থাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে শেখার এবং পরবর্তী প্রজন্মের যুক্তি ও জ্ঞানকে মর্যাদা দেওয়ার।

এসব বক্তব্য রাখার পাশাপাশি, আদিবাসীদের ধর্ম বিষয়ে অন্য দুটি কথা না বললে অন্যায় হবে। 'সারি ধরম' বা 'সারণা' ধর্ম, নাম যা-ই হোক, আদিবাসীদের ধর্ম তথাকথিত অগ্রসর সম্প্রদায়ের ধর্ম থেকে কয়েক দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছে। আদিবাসীদের সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম মূলে প্রকৃতি ও পরিবেশবাদী ধর্ম। তাঁদের সমস্ত বংগা কিংবা বুরু গাছপালা, জঙ্গল, জন্তুজানোয়ার, নদী, আকাশ, বাতাস প্রভৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন। সাঁওতালদের জাহের থান আসলে একটি কুঞ্জ, পবিত্র কুঞ্জ, এখানে থাকার কথা বিভিন্ন আদিম মহীরুহের (primordial trees)। এখানে উপাসনার মাধ্যমে সাঁওতালরা আসলে পৃথিবীকেই ধন্যবাদ দেন যে, পৃথিবী তার সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ যে জীবনের জন্য জরুরি তারই স্বীকৃতি এই উপাসনাস্থল এবং সর্বপ্রাণবাদী উপাসনার রীতিপদ্ধতি। এটি অপরাধস্বীকারের প্রতীকও বটে। জীবনের প্রয়োজনে বনজঙ্গল কেটে আদিবাসীরা চাষের জমি বের করলেন, তাতে কাটা পড়ল বেশকিছু গাছপালা। তাই, যে জঙ্গল কেটে ওই চাষজমি তৈরি হল সেই জঙ্গলের একটা অংশ রাখা হল অক্ষুণ্ণ এবং সেটি সাব্যস্ত হল উপাসনাস্থল। আদিবাসী নিয়ম অনুযায়ী, উপাসনাস্থলের ওই অবশিষ্ট গাছপালা কেউ বিনাশ করতে পারবে না। করতে চাইলে বা করলে, সে হবে তাঁদের ঈশ্বরের কাছে অপরাধ।

এ ছাড়াও, আদিবাসী সমাজের যৌনচেতনা অন্যান্য সমাজের যৌনচেতনার তুলনায় অনেক এগিয়ে। যে যৌনশিক্ষা আজ স্কুলের পাঠ্যক্রমে রাখতে গিয়ে আমরা হেঁচে-কেশে অস্থির হই, সেই যৌনচেতনা আদিবাসী সামাজিক চেতনায় অত্যন্ত সহজে, সামাজিক শিক্ষা ও আচরণের মধ্যে দিয়েই গৃহীত হয়। এই বিষয়গুলি আমাদের আদিবাসীদের কাছ থেকে শেখা উচিত।

এমন একটি সম্প্রদায়ের ধর্মেও যখন কুসংস্কার বাসা বাঁধে, ডালপালা ছড়ায়, তখন তার সংশোধন আদিবাসী শিক্ষিতের কর্তব্য। এমনকী, মনেপ্রাণে নাস্তিক হলেও, দূরে সরে আসা কাম্য নয়। আর, যে ধর্মপরায়ণ তার কর্তব্য এই যে, ধর্মের বীজ যেন সমাজে হানাহানির কারণ হয়ে না ওঠে। সমস্ত ধর্মেরই কতগুলো ভালো শিক্ষা আছে, সেই শিক্ষাগ্রহণ করতে গোঁড়া না হলেও চলে, এমনকি নাস্তিক হলেও চলে।

আদিবাসী ধর্মের অসাধারণ ভালো কিছু দিক সত্ত্বেও, কিছু প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কারের কারণে শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিছু বাধা আসে। শিক্ষিত মন যদি কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করে, সনাতন পন্থা যাকে অকর্তব্য সাব্যস্ত করেছে তেমন কিছুকে যুক্তির আলোয় কর্তব্য মনে করে, তখন তাকে যদি সামাজিক শাস্তি দেওয়া হয়, সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয় কিংবা, একঘরে করে দেওয়া হয়, সেটা শিক্ষার পরিপন্থী হিসাবেই কাজ করবে। এ-কথা সব ধর্মের ক্ষেত্রেই সত্যি।

আসা যাক আদিবাসী নারীদের শিক্ষার সমস্যার বিষয়ে। প্রথমেই বলে নেওয়া যাক যে, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তুলনায়, আদিবাসী সম্প্রদায় নারীদের অনেক বেশি স্বাধীনতা এবং সম্মান দিয়েছে। কিন্তু, তাই বলে তাকে পুরুষের সমান জ্ঞান করেনি। হিন্দুধর্মে হাজার শাস্ত্রে এক-একটায় এক-এক রকম কথা বলা আছে। বলা কিংবা লেখা যা-ই থাক, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম নারীকে পুরুষের সমান মনে করে না। হিন্দু মৌলবাদ তো করেই না। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন কেউ করে না।

ইসলামেও, ইসলামী ধর্মতত্ত্বে যা-ই বলা থাক, যে নিদানই দেওয়া থাক, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান গণ্য করা হয় না। বস্তুত, এমন ধর্ম নেই যা নারীকে পুরুষের সমান মনে করে। আদিবাসী ধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ, আদিবাসী সমাজও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। আদিবাসী ধর্মীয় আচারে নারীকে খোলাখুলিই পুরুষের তুলনায় হীন ঘোষণা করা হয়েছে। জাহের ইত্যাদি উপাসনাস্থলে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অন্যান্য বহু পূজা বা উপাসনার ক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। কোনো নারী 'নাইকে' বা পুরোহিত হতে পারেন না। নারী কখন কী করতে পারবেন, কী পারবেন না, তা আরও অনেক আচার ও আচরণগত অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। এই বৈষম্য নারীদের শিক্ষাগ্রহণের পথে বাধা হওয়া স্বাভাবিক এবং তা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত।

আদিবাসী সমাজ নারীদের জন্য মূলত গেরস্থালির কাজ নির্দিষ্ট করলেও, বাইরেও কিছু কাজের অধিকার দিয়েছে। এ ছাড়া, নিজের সম্পত্তি ও রোজগারের অধিকার দিয়েছে। সম্পত্তি, বিশেষত, জমিজমার বিষয়ে এই অধিকার বাস্তবে প্রয়োগের নজির খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু, দৈনন্দিন রোজগার নিজের কাছে রাখায় বাধা নেই। তবে, বাস্তবে সেক্ষেত্রে পুরুষের বক্তব্য থাকে না এমনও নয়। কিন্তু, নারীদের রোজগারের সেই পরিসরও কমে এসেছে। জঙ্গলের পরিমাণ কমে আসায় সেখান থেকে কুড়ানো কাঠ, পাতা ইত্যাদি বাজারে বিক্রির দরুণ যে রোজগার তা কমেছে। আদিবাসী সমাজে মদ্যপানের নেশা একটা সমস্যা। কিন্তু, রোজগারের তাগিদে, হাঁড়িয়া বা মহুয়া তৈরি ও বিক্রি করেন আদিবাসী মহিলারাই। এলাকার বাইরে, অন্যের বিশেষত অন্য সম্প্রদায়ের জমিতে তাঁরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রোজের কাজ করতে যান। আদিবাসী সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে কন্যাপণ প্রচলিত। কিন্তু, আজকাল বরপণ দাবি করার নজিরও পাওয়া যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে নেই এ হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব। এই প্রভাব সম্ভবত বাড়ছে।

দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশের আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে আরএসএস ও বিজেপির অস্তিত্ব ক্রমবর্ধমান দেখা যাচ্ছে। একসময় উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে নির্বাচন জিতত তথাকথিত সেকুলার দল কংগ্রেস। ত্রিপুরায় বামপন্থীরা। এখন সেখানে নির্বাচন জিতছে বিজেপি এবং তাদের সহযোগীরা। মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখন্ডও বিজেপি শাসন করছে। ঝাড়খন্ডে বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে ১৪ আসনের মধ্যে ১১ আসনে জিতেছে। ছত্তিশগড়ে ১১ লোকসভা আসনের ৯ আসন বিজেপির। পশ্চিমবঙ্গে গত লোকসভা নির্বাচনে আদিবাসী অঞ্চলগুলির বেশ কয়েকটিতে বিজয়ী বিজেপি।

এইখান থেকেই আদিবাসী ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে অন্য ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবের আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে ধর্মান্তর বলতে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বুঝি নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে হয় ইসলাম, নয় খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করা বা করানো। ইসলাম যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে পুরোনো ধর্মের সংযোগ সাধারণত একেবারেই থাকেনি। যাদের ক্ষেত্রে থেকেছে, কমই থেকেছে। কোনো হিন্দু ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলে এমনটা ঘটে না যে, তিনি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ছেন, আবার বাড়িতে শালগ্রাম শিলা রাখছেন। এলাকাভিত্তিক দুই ধর্মের বিশ্বাসের কিছু সমন্বয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় অবশ্যই। যেমন পিরের দরগায় সিন্নি চড়ানো, বনবিবির পূজা দিয়ে জঙ্গলে ঢোকা ইত্যাদি। কিন্তু, ওই পর্যন্তই। এবং, এগুলি মূলত সীমিত নিম্নবর্গের দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। খ্রিস্টান ধর্ম যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গেও পুরনো ধর্মীয় বা সামাজিক আচারের যোগ সাধারণত থাকেনি। তাঁরা চার্চে যান, জিশুর উপাসনা করেন। খ্রিস্টান পার্বণগুলিই পালন করেন। কিন্তু, যে আদিবাসীরা হিন্দু সমাজের কাছাকাছি এসেছেন, নিজেদের ক্রমশ হিন্দু বলে মনে করেছেন, তাঁদের মধ্যে পুরোনো আদিবাসী ধর্মবিশ্বাস তুলনায় কমবেশি থেকে গিয়েছে। তাঁরা হিন্দু উৎসবে সামিল হওয়ার পাশাপাশি, অনেকেই আদিবাসী প্রথা ও পার্বণও পালন করেন। আদিবাসী জীবনযাপনের ধারা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ তাঁরা করেন না বা, করতে পারেন না। হিন্দুরা আদিবাসীদের দেব-দেবীদের গ্রহণ করেন, তাঁদের হিন্দুত্ব আরোপ করেন, সেই আরোপিত রূপ আদিবাসীরা অনেকসময় মেনে নেন। এ একদিনে ঘটে না। দীর্ঘ সময়ের পথে এই বিবর্তন ঘটে এবং এর প্রকৃতি সরল একমুখী বা একমাত্রিক হয় না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিন্দু ও আদিবাসী ধর্মাচরণের মধ্যে বেশকিছু মিল আছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রবেশ করতে হয় এক বিস্তৃত জটিল বিতর্কে। এই প্রবন্ধে সেই বিশদ আলোচনার পরিসর নেই। আপাতত সে বিতর্কে যাব না। শুধু এটুকু বলে রাখা ভালো যে, কেউ বলেন আদিবাসী ধর্ম হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করেছে, কেউ

বলেন হিন্দুধর্মাচরণ আদিবাসীদের প্রভাবিত করেছে। এদেশে পাশাপাশি দুই সম্প্রদায় বাস করছে দীর্ঘদিন। পারস্পরিক প্রভাব কিছু থাকা স্বাভাবিক। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলেও বহু জায়গায় দেখা যায় আদিবাসী পাহান ও হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিত একই ধর্মস্থানে একই দেব-দেবীর পূজা করছেন। কিন্তু, এও মনে রাখতে হবে যে, ঐতিহাসিকভাবে, হিন্দু ও আদিবাসী যোগাযোগ মোটের উপর সীমিত থেকেছে। আদিবাসীরা আজও হিন্দুদের 'দেকো' বা আদিবাসী সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বহিরাগত বলেই মনে করেন।

হিন্দুরাও আদিবাসীদের নিজেদের সমকক্ষ মনে করেন না। কিন্তু, এই সমস্ত কিছুর পরেও, দুই সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণে অনেকটাই মিল দেখা যায়। আজকাল আদিবাসীদের একাংশ নিজেদের হিন্দু বলেই পরিচয় দেন। ঝাড়গ্রামের মুন্ডা, ভূমিজ, মাহালি, শবর সম্প্রদায় নিজেদের আদিবাসী বলেন না। আদিবাসী বলতে তাঁরা বোঝেন সাঁওতালদের। তার কারণ, পশ্চিমবঙ্গে মুন্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায় হিন্দুদের সংস্পর্শে এসেছেন বেশি। অন্যদিকে, সাঁওতালরা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি অনেকটাই বজায় রেখেছেন। এতৎসত্ত্বেও, তাঁদের সঙ্গেও হিন্দুদের ধর্মাচরণের কিছু মিল দেখা যায়। এই পথেই ইদানীংকালে হিন্দু মৌলবাদী ভাবনা প্রবেশ করছে আদিবাসীদের মধ্যে। হিন্দুরা যাঁদের দীর্ঘকাল বর্বর বন্য বলে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, নানান পদ্ধতিতে অবিচার করেছেন, শোষণ করেছেন, সেই হিন্দুরা আজ আদিবাসীদের কাছের লোক বলে নিজেদের প্রমাণ করতে চাইছেন। আদিবাসীদেরও একটা অংশ, যাঁরা দীর্ঘদিন হিন্দুদের 'দেকো' মনে করে এসেছেন, তাঁরা আজ যেন কট্টর হিন্দু মৌলবাদের প্রভাবে হিন্দুত্বের ছাতার তলায় একজোট হচ্ছেন। এ এক জটিল আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি।

ইউরোপীয় মিশনারিরা এদেশে ধর্মপ্রচার করতেই এসেছিলেন, আজও তা-ই করেন। ধর্মতত্ত্বগতভাবেই, তাঁদের লক্ষ্য আদিবাসীদের ধর্মান্তরণ। কিন্তু, সেই কাজটি তাঁরা শুধু বাইবেল আউড়ে বা, খ্রিস্টধর্মই আসল ধর্ম এই বাণী প্রচার করে করেন না। ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি তাঁরা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদিও স্থাপন করেছেন। এসবের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যার সুরাহা হয়েছে। এই কারণেই উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী খ্রিস্টান জনসমাজ অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায় অন্যদের তুলনায় অগ্রসর। ধর্মান্তর সমর্থন না করেও, মিশনারিদের সমাজসেবার কাজটিকে প্রশংসা করা যায়। খ্রিস্টান মিশনারিদের গালি দেবার আগে মনে রাখা উচিত যে, সামাজিক কল্যাণের এই ক্ষেত্রটিতে শূন্যস্থান থেকেছে বলেই তাঁরা এখানে প্রবেশ করতে পেরেছেন।

হিন্দু নিম্নবর্গ এবং আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মিশনারি না হয়েও, মিশনারি মডেল অনুসরণ করা যায়। উচ্চশিক্ষিত নিম্নবর্গ হিন্দু এবং আদিবাসীরা যখন গ্রামে থাকবেন না বা, থাকতে পারবেন না, আপওয়ার্ড মোবিলিটির ধারায় তাঁরা শহরাঞ্চলেই পৌঁছবেন, তখন স্কুলস্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি উচ্চশিক্ষিতের প্রতীক্ষায় না থেকে, দু-একজন পাওয়া গেলেও তাঁদের নেতৃত্বে গ্রামীণ শিশু ও বালক-বালিকাদেরই একে অপরের শিক্ষায় সচেষ্ট করে তোলা যায়। ব্যাপারটা এইরকম, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষাগত যোগ্যতা যেসব বালক-বালিকা আয়ত্ত করল তারা নীচের দিকের শ্রেণিগুলিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেবে। অষ্টম শ্রেণির যোগ্যতা যারা আয়ত্ত করল তারা তার নীচের দিকের শ্রেণিগুলির দায়িত্ব নেবে। এই কাজে এযাবৎ নিরক্ষর বা তুলনায় স্বল্পশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদেরও পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা নতুন করে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর স্কুলে ও বাড়িতে শিশুদের পাঠাভ্যাসের দায়িত্ব নিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, এটা সরকারি মূলস্রোতের প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা নয়। এ এক বিকল্প ব্যবস্থা। কিন্তু, শিক্ষানীতিগুলিতে এর স্বীকৃতি আছে এবং এর জন্য জায়গা রাখা আছে। প্রয়োজনে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য মাধ্যমে এর গুরুত্ব সরকার ও শিক্ষানীতিপ্রণেতাদের কাছে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। আরও সরকারি সহায়তা চাওয়া যেতে পারে। মোটের উপর, এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তার জায়গা আছে। শিক্ষাবিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারেন এবং সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যেতে পারে।

এই আলোচনা শেষ করার আগে একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈকা অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে কোনো এক কলেজের অসংরক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈকা ছাত্রী সামাজিক মাধ্যমে কিছু বিষোদ্‌গার করে। ছাত্রীটি অধ্যাপিকাকে সরাসরি আঘাত করে, তাঁর প্রতি অপমানজনক বক্তব্য রাখে। ছাত্রীটির বক্তব্যে এ-কথা স্পষ্ট যে, সে সংরক্ষণের বিরোধী। তার ধারণা, অধ্যাপিকা সংরক্ষিত আসনে বিশ্ববিদ্যালয়ের

চাকরিটি পেয়েছেন। তার ধারণা, তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষ অসংরক্ষিত সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের তুলনায় শিক্ষাগত যোগ্যতায় হীন। সম্ভবত, মানুষ হিসাবেও তাঁদের সে হীনপ্রকৃতি বলেই মনে করে। স্বাভাবিক চেতনায় এবং দেশের সংবিধান ও আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এ এক গুরুতর অপরাধ। ছাত্রীটির এই ধারণার মূলে আছে ভারতীয় সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে সার্বিক অজ্ঞতা এবং তার হিন্দু সমাজের বর্ণগত বিন্যাসে বিশ্বাস যা হিন্দুধর্মের প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে আজও জাতপাতের উচ্চ-নীচের স্বীকৃতি দেয়।

মহানগরে যে মৌলবাদী ধর্মীয় সামাজিক বিশ্বাস ও সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে এবং প্রচারে প্রভাবিত এক বর্ণহিন্দু ছাত্রী এক আদিবাসী অধ্যাপিকাকে তাঁর জাত ও সম্প্রদায় উল্লেখ করে অপমান করে, সেই ধর্মীয় ও সাংগঠনিক শক্তির প্রভাবেই গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাংশ হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের শরিক হয়। এ কি এক আশ্চর্যের ব্যাপার নয়! আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও, বাস্তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু হয়তো নেই। এই আপাত পরস্পরবিরোধী ঘটনা সম্ভবত প্রমাণ করে শহরাঞ্চলের শিক্ষিত আদিবাসীদের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ আদিবাসী মানুষের দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা। প্রসঙ্গত, মনে করা যেতে পারে ডাক্তার সৌভেন্দ্র শেখ র হাঁসদা, তাঁর গল্পসংকলন 'দি আদিবাসী উইল নট ড্যান্স', সেটির বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের ক্ষোভ এবং ফলত, ২০১৭ সালে ডাক্তার হাঁসদার চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া এবং বইটি ঝাড়খন্ডে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া। সেই সময় ঝাড়খন্ডে শাসক দল বিজেপি এবং বিরোধী দল ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা। শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষই ছিলেন ডাক্তার হাঁসদার বিরোধী, দুই পক্ষই চেয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পরে, ২০১৮ সালে অবশ্য বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় এবং ডাক্তার হাঁসদাও তাঁর চাকরি ফিরে পান।

শহরাঞ্চলে শিক্ষিত আদিবাসী মানুষদের সেখানকার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ মনে করছে অর্থনৈতিক বিশেষত, সরকারি চাকরিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদিকে, শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণে গ্রামাঞ্চলের আদিবাসীদের বেশিরভাগের প্রাথমিক লক্ষ্য মোটা বেতনের শহুরে সরকারি চাকরি নয়। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, গ্রাম ও মফস্সলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষিত তপশিলি উপজাতি আসনগুলির একটা বড়ো অংশ ফাঁকা থাকে। এক্ষেত্রে, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে আদিবাসীদের প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাই অনেকটাই অনুপস্থিত। ধর্মীয় সংস্কার এবং আচারে মিল থাকার কারণে তাই আদিবাসীরা হিন্দুত্ববাদী সাংগঠনিক শক্তির সঙ্গে হাত মেলান। আরও একটা বিষয় এক্ষেত্রে কাজ করে। আগেই এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, বর্তমান প্রজন্মের আদিবাসীরা অনেকেই তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতির খুঁটিনাটি জানেন না। তাঁরা সম্ভবত মনে করেন, তাঁদের ধর্মকে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের ধাঁচে ফেলতে পারলে তা দেশে হিন্দুধর্মের সঙ্গে তুলনীয় মান্যতা পাবে। শহরাঞ্চলের শিক্ষিত আদিবাসী সম্ভবত এভাবে ভাবেন না। ধর্মভিত্তিক সামাজিকতার কারণে শিক্ষিত এবং সাধারণ, শহুরে ও গ্রামীণ আদিবাসীর জগৎ হয়তো আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং, এই সমস্যার ভিতও প্রোথিত ধর্মীয় সংস্কারে বলেই মনে হয়।

ভারতীয় সমাজের ইতিহাস খতিয়ে দেখলে, আদিবাসী ও নিম্নবর্গ হিন্দুদের কোনোভাবেই খাটো করা যায় না। দেশের যাবতীয় পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও এঁদের অবদান সবার আগে। যখন কংগ্রেস তৈরি হয়নি, মহাত্মা গান্ধী আসেননি, জওহরলাল, সুভাষ, বাঘা যতীন, ভগত সিং প্রমুখ সর্বজনপরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আন্দোলন শুরু করেননি, তখন আদিবাসী এবং নিম্নবর্গ হিন্দুরা একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে। নেতৃত্ব দিয়েছেন বিরসা মুন্ডা, বাবা তিলকা মাঝি, সিধু মুর্মু, কানহু মুর্মু প্রমুখ আদিবাসী নেতারা। ভারতে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এই আন্দোলনগুলির বিস্তৃত বর্ণনা এবং এই নেতাদের সমমর্যাদাব্যঞ্জক উল্লেখ থাকে না। থাকা দরকার। উচ্চবর্ণ হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জানা উচিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে আদিবাসী ও নিম্নবর্গ হিন্দুদের অবদান। পূর্বোল্লিখিত ছাত্রীটি এসব জানে না। সে জানে না যে, আদিবাসী সম্প্রদায়ও কিন্তু অন্-আদিবাসীদের তাঁদের তুলনায় হীন জ্ঞান করেন। তার কারণও আছে। অন্-আদিবাসী যেমন, উচ্চবর্ণ হিন্দুরা সত্যিই তো জানেন না প্রকৃতি এবং পরিবেশের মর্যাদা, পারেননি নারীদের মর্যাদা দিতে যে-ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজ কিছু হলেও এগিয়ে আছে। ছাত্রীটির চেতনায় স্পষ্ট নয় যে, তার নিজের হিন্দু সমাজে তার নিজের অবস্থান কী। সে জাতপাতের উচ্চনীচ প্রশ্রয় দেয়, অথচ ভাবে না যে হিন্দু সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্যের শিকড় কত গভীরে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে

দেশের বর্তমান আইন অনুযায়ী মোকদ্দমা ইত্যাদি হতেই পারে। সন্দেহ থাকে তাতে প্রকৃত সমাধান হবে কি না। সমাজে অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতেই অপরাধ দমনের আইন তৈরি হয়েছে। আইন না থাকলে অপরাধ হয়তো আরও বেশি হত, কিন্তু আইন কোনো অপরাধকেই নির্মূল করতে পারেনি। জাতপাতের ভিত্তিতে অনাচার এবং কটুকাটব্য তো আরও অন্য এক প্রকৃতির অপরাধ। এই জিনিস আইনি পদ্ধতিতে দূরীভূত হবে বলে মনে হয় না। এর ভিত আসলে ধর্মে, ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে। ভারতে সামাজিকতা, যে-কোনো সম্প্রদায়ের সামাজিকতা, তার ভিত আছে সম্প্রদায়ের ধর্মে। ধর্ম ব্যাপারটার গুরুত্ব কমাতে হবে। এ-বিষয়ে আর চোখ বন্ধ করে থাকা যাবে না।

শিক্ষায় প্রগতির একটাই রাস্তা। সরকার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মকে দূরে রাখা। ধর্মবিশ্বাস থাকতেই পারে, আপন ধর্মাচরণ মানুষ করতেই পারেন। কিন্তু, সে আপন গৃহে। অন্তত সরকারি কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রকাশ গর্হিত সাব্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্যত্রও এর প্রকাশ যেন অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আঘাত না করে তা-ও নিশ্চিত হওয়া উচিত। আইন তো এসব বিষয়ে অবশ্যই জরুরি। প্রয়োজনে, কঠোর আইন। কিন্তু, তার চেয়েও জরুরি চেতনার বিকাশ। ব্যক্তি এবং অ-রাজনৈতিক সংগঠনকে এই কাজে এগিয়ে তো আসতেই হবে, রাজনৈতিক দলগুলিও একটু এই দায়িত্ব নিক না, তাদের এযাবৎকালের নির্বাচন-কেবলম্ ধারা ছেড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতা অত্যন্ত জরুরি। জরুরি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ। ভারতের মতো বহু ধর্মের ও ধর্মভিত্তিক সামাজিক বৈচিত্র্যের দেশে তো অবশ্যই। কোনো কারণেই আমাদের সংবিধান এবং রাষ্ট্রনীতি থেকে সমাজতান্ত্রিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিসর্জন দেওয়া চলে না। সমাজতান্ত্রিকতা এবং সার্থক শিক্ষার খাতিরেই, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার। ভাবা দরকার যে, ধর্মের সঙ্গে কতদূর আপস করে ধর্মনিরপেক্ষ থাকা সম্ভব। বোঝা দরকার, ধর্মকে ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, ধর্মের প্রয়োজন হয় ঈশ্বরকে। ধর্মের রাজনীতি তাই হয়ে ওঠে ঈশ্বরকে নিয়ে রাজনীতি। মানুষ হয়ে পড়ে গৌণ। আমরা শিক্ষা এবং শিক্ষানীতির কথা ভাবছি। মানুষের শিক্ষা, মানুষের জন্য। শিক্ষায়তন থেকে ঈশ্বর না হয় দূরেই থাকলেন। তাঁর জন্য তো মন্দির, মসজিদ, গির্জা কম নেই দেশে। এসব না থাকলেও ঈশ্বরের কিছু যেত-আসত না। আস্তিক্যবাদীরা তো মানেনই, গোটা দুনিয়াটাই তাঁর। তাঁর জন্য ছোটো-বড়ো হাজারও উপাসনাস্থল গড়ে তাঁকে অপমানই কি করা হয় না! ঈশ্বর তো কারও বাপের নন। তিনি কারও দাপেরও অধীন নন। তাঁকে নিয়ে ভাগাভাগি তথা শ্রেষ্ঠত্বের দাপাদাপি শিক্ষাক্ষেত্রে না হয় না-ই হল!

---

1. শেখর মুখোপাধ্যায়, 'শিক্ষানীতি কয়েকটি প্রশ্ন', দেশ, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ ৩১-৩৫
2. Govt. of India, Ministry of Education, Report of the Education Commission (1964-66): Education and Education and National Development, Report of the Education Commission (1964-66), NCERT, New Delhi, 1970, p. 961.
3. (NPE 1968) Govt. of India, Ministry of Education, National Policy on Education 1968, New Delhi, p-9.
4. (NPE 1986) Govt. of India, Ministry of Education, National Policy on Education 1986, New Delhi, p-29.
5. (NEP 2020) Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, National Education Policy 2020, New Delhi, p-61.
6. Ibid. p. 32, 34.
7. NPE 1986, p. 105, 136.
8. J.B.G. Tilak, 'The Kothari Commission and Financing of Education', Economic and Political Weekly, vol. 42, no. 10, (March 10-16), 2007, p. 875.
9. Govt. of India, Ministry of Education, Report of the Education Commission (1964-66): Education and National Development, New Delhi, Chapter XIX.
10. NEP 2020, pp. 60-61.
11. শেখর মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত।
12. তদেব
13. https//data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm
14. শেখর মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত।
15. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSSO, 71st Round, (January-June, 2014); Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSSO, 75th Round, (July 2017-June, 2018). (Hereafter referred to as NSS 71st Round and NSS 75th Round respectively)

16. Ambrish Dongre, Avani Kapur, Vibhu Tewary, How Much Does India Spend Per Student on Elementary Education?, Accountability Initiative, Centre for Policy Research, New Delhi, 2014, p. 12.
17. Govt. of India, Census of India 2011, Status of Literacy, Chater 6; NSS 71st Round.
18. https://thewire.in/rights/adivasi-religion-recognition-census; https://www.ucanews.com/news/indian-tribals-rally-for-recognition-of-their-religion/87255
19. K. M. Singh, History of Christian Missions in Manipur and other Neighbouring States, Mittal Publications, New Delhi, 1991.
20. M. Horam, North East India: A Profile, Cosmo Publications, New Delhi, 1990, pp. 174-180.
21. B. Datta Ray, Tribal Identity and Tension in North East India, Omsons Publications, New Delhi, 1989.
22. Hoineilhing Sitlhou, 'Straying beyond Conquest and Emancipation: Exploring the Fault Lines of Missionary Education in North East India', Indian Anthropologist, Vol. 39, No. 1/2 (January – December 2009), pp. 65-84 (Available at JSTOR – https://www.jstor.org/stable/41920091)
23. Ibid.
24. Harish K. Puri, 'Scheduled Castes in Sikh Community: A Historical Perspective', Economic and Political Weekly, Vol. 38, No. 26 (June 28 – July 4, 2003), pp. 2693 – 2701 (Available at JSTOR – https://www.jstor.org/stable/4413731)
25. S.S. Ahmad, A.K. Chakravarti, 'Some Regional Characteristics of Muslim Caste Systems in India', GeoJournal, No.5,1981,pp.55–60.(Available athttps://link.springer.com/article/10.1007/BF00185243); A. R. Momin, 'Muslim Caste: Theory and Practice' (Review of 'Caste and Social Stratification among the Muslims' ed. by Imtiaz Ahmad, Manohar Book Service, Delhi, 1973), Economic and political Weekly, Vol. 10, No. 14, (April 5, 1975), pp. 580-582. (Available at https://www.jstor.org/stable/4537008). There are some books written in Hindi too on the subject. 1) Ali Anwar, Masavaat Ki Jang: Bihar Ke Pasamanda Musalman, Vaniprakashan, New Delhi; 2) Masud Alam Falahi, Hindustan Me Zaat Paat Aur Musalmaan, Al Qazi, New Delhi, 2007.
26. Seik Rahim Mondal, 'Social Structure, OBCs and Muslims', Economic and Political Weekly, Vol. 38, No. 46 (November 15-21, 2003), pp. 4892-4897. (Available at https://www.jstor.org/stable/4414284).
27. Aparna Bandyopadhyay, Desire and Defiance: A Study of Bengali Women in Love, 1850-1930, Orient BlackSwan, New Delhi, 2016, Chapters 3-5; অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হায় গৃহহারাখ', মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় ও অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), নহি সামান্যা নারী ইতিহাসে, সমাজে, চিন্তায়, সেতু, ২০১৮, পৃঃ ৬৫৩-৬৬৯; Flavia Agnes, Law and Gender Inequality: The Politics of Women's Rights in India, Oxford university Press, Oxford, 1999; Jasodhara Bagchi (ed.), Indian Women: Myth and Reality, Sangam Books, Hyderabad, 1995; Arpita Banerjee, 'Status of Women and Gender Discrimination in India', International Journal of Development Research, Vol. 3, Issue 2, 2013, pp. 57-64; Karen Leonard, 'Women and Social Change in Modern India', Feminist Studies, Vol. 3, No. 3/4, (Spring-Summer 1976), pp. 117-130, (Available at https://www.jstor.org/stable/3177731).
28. কুমুদনাথ মল্লিক, সতীদাহ, শিশু প্রেস, কলিকাতা, ১৩২০, পৃ ৪৪
29. ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, 'লেডি ব্রেবোর্ন কলেজঃ মুসলিম নারীশিক্ষায় অনন্য উদ্যোগ', মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় ও অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), নহি সামান্যা নারী ইতিহাসে, সমাজে, চিন্তায়, সেতু, ২০১৮, পৃঃ ৪৩৯-৪৫৫।
30. Aparna Bandyopadhyay (2007); অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, 'ধর্ম, পরিবার ও বিবাহঃ ভারতীয় মহিলাদের জীবনে মূল্যবোধের ধরাবাহিকতা ও দ্বান্দ্বিকতা', মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় ও অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), নহি সামান্যা নারী ইতিহাসে, সমাজে, চিন্তায়, সেতু, ২০১৮, পৃঃ ৫৫৫-৫৬৩।
31. Zarina Bhatty, Purdah to Piccadilly: A Muslim Woman's Struggle for Identity, Sage, New Delhi, 2016; Seema kazi, Muslim Women in India, Minority Rights Group, UK, 1999; Nida Kirmani, 'Deconstructing and Reconstructing 'Muslim Women' through Women's Narratives, Journal of Gender Studies, Vol. 18, Issue 1, 2009; Vrinda Narain, Gender and Community: Muslim Women's Rights in India, University of Toronto Press, Toronto, 2001; A. A. Engineer (ed.), Islam Women and Gender Justice, Gyan Publishing House, New Delhi, 2001; Zakia Abedi, Indian Muslim: Social, Educational and Economic Status, Arise Publishers, New Delhi, 2011; Haseena Hashia (ed), Muslim Women in India since Independence, (Feminine Perspective), Institute of Objective Studies, New Delhi, 1998; আফরোজা খাতুন, 'ধর্ম, সমাজ ও মুসলিম মেয়ে এবং বাংলা ছোটগল্প', মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় ও অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), নহি সামান্যা নারী ইতিহাসে, সমাজে, চিন্তায়, সেতু, ২০১৮, পৃঃ ৪৭৯-৪৮৮।
32. U-DISE, 2015-16, School Education in India, National University of Educational Planning and Development, New Delhi.
33. Govt. of India, Census 2011.
34. NSS 71st Round, NSS 75th Round. (Here instead of GER, we find Gross Attendance Ratio (GAR)).

35. Dayabati Roy, 'Caste and Power: An Ethnography of West Bengal', Modern Asian Studies, Vol. 46, Issue 4, July 2012, pp. 947-974.

36. Hitesranjan Sanyal, Social Mobility in Bengal, Papyrus, Calcutta, 1981

37. Govt. of India, Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report, 2006. (Sachar Committee Report)

38. Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, All India Survey on Higher Education 2018-19.

39. Dana Dunn, 'Gender Inequality in Education and Employment in the Scheduled Castes and Tribes of India', Population Research and Policy Review, Vol. 12, No. 1, 1993; N. Halim, K.M. Yount and S. Cunningham, 'Do Scheduled Caste and Scheduled Tribe Women Legislators Mean Lower Gender-Caste Gaps in Primary Schooling in India?', Social Science Research, 58, July 2016, pp. 122-134; Arun Kumar Ghosh, 'The Gender Gap in Literacy and Education among the Scheduled Tribes in Jharkhand and West Bengal', Sociological Bulletin, Vol. 56, No. 1 (January-April 2007), pp. 109-125.

40. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৯৯৯; পরিমল হেমব্রম, সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৭; সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ আদিবাসী, অফবিট পাবলিকেশন, ২০১৪; সুহৃদকুমার ভৌমিক, বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য, মনফকিরা, কলকাতা, ২০০৯; সুবোধ ঘোষ, ভারতের আদিবাসী, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলকাতা, ১৩৫৫

41. Sumit Guha, Environment and Ethnicity in India, 1200–1991, Cambridge University Press, Cambridge, 1999; Amita Baviskar, 'Written on the Body, Written on the Land: Violence and Environmental Struggles in Central India', in Nancy Lee Peluso and Michael Watts (eds.), Violent Environments, Cornell University Press, New York, 2001, pp. 354-379; Amita Baviskar, 'Adivasi Encounters with Hindu Nationalism in MP', Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 48, (November 26 – December 2, 2005), pp. 5105-5113.

42. L. O. Skrefsrud, Traditions and Institutions of the Santals: Horkoren Mare Hapramko Reak Katha, (Translated by P.O. Bodding from Santali Text of 1887), Oslo Ethnografiske Museum, Oslo, 1942, pp. 7-9; H. H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Vol. 1, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, pp. xlii-xlix; Nabendu Datta-Majumdar, The Santal: A Study in Cultural Change, Govt. of India, Department of Anthropology, 1956, pp. 40-42.

43. Govt. of Orissa, Department of School and Mass Education, Expert Committee Report on Use of Ol-Chiki Script in Mayurbhanj District of Orissa, 2005; Nizamuddin Ahmed and Swami Tattwasarananda, 'Education of Santals of Jhargram: An Ethnographic Study', Journal of Humanities and Social Science, Vol. 23, Issue. 7, Ver. 3 (July 2018), pp. 51-58; S. Patra and N. Panigrahi, 'Educational Status of the Marginalized: A Study among the Santals of Paschim Medinipur District, West Bengal', Journal of Social Science, 57 (1-3), 2018, pp. 22-28;

44. Govt. of India, Ministry of Tribal Affairs, Statistical Division, Statistical Profile of Scheduled Tribes in India 2013.

45. Ruth Lalsiemsang Buongpui, 'Gender Relations and the Web of Traditions in Northeast India', The NEHU Journal, Vol. XI, No. 2, July 2013, pp. 73-81. (Available at https://www.nehu.ac.in/public/assets/files/journals/JournalJuly_DecArt5111213.pdf); Nayan Jyoti Das, 'Santali Women: Under the Shadow of Long Silence', International Journal of Humanities & Social Science Studies, Vol. II, Issue I, July 2015, pp. 207-212; Veena Vasin, 'Status of Tribal Women in India', Studies on Home and Community Science, Vol. 1, Issue 1, 2007, pp. 1-16.

46. Nitya Rao, 'Good Women do no Inherit Land': Politics of Land and Gender in India, Social Science Press and Orient BlackSwan, New Delhi, 2008; P.G. Jogdand (ed.), Dalit Women in India: Issues and Perspectives, Gyan Publishing House, New Delhi, 1995; Samita Manna, The Fair Sex in Tribal Cultures: Problems and Development, Gyan Publishing House, New Delhi, 2001; Nayan Jyoti Das, 'Santali Women: Under the Shadow of Long Silence', International Journal of Humanities & Social Science Studies, Vol. II, Issue I, July 2015, pp. 207-212; Veena Vasin, 'Status of Tribal Women in India', Studies on Home and Community Science, Vol. 1, Issue 1, 2007, pp. 1-16; Virginius Xaxa, 'Women and Gender in the Study of Tribes in India', Indian Journal of Gender Studies, Vol. 11, Issue 3, October 2004, pp. 345-367.

47. H. H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Vol. 1, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, pp. xxviii-xxix.

48. Basanta Kumar Mohanta, 'Rituals and Festivals of The Ho Tribe', The Tribal Tribune, Vol. 2, Issue 2, 18 October 2005. (Available at https://www.etribaltribune.com/index.php/volume-2/mv2i2/rituals-and-festivals-of-the-ho-tribe); Durga Bhagvat, 'Tribal Gods and Festivals in Central India', Asian Folklore Studies, Vol. 27, No. 2 (1968), pp. 27-106.

49. শেখর মুখোপাধ্যায়, 'জীবন, জীবিকা, জঙ্গল', নতুন কৃত্তিবাস, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭, পৃঃ ৮০-১১৬।

50. Basanta Kumar Mohanta (2005), op. cit.; Durga Bhagvat (1968), op. cit.

51. শেখর মুখোপাধ্যায় (২০১৭), প্রাগুক্ত।

52. Virginius Xaxa, "Politics of Language, Religion and Identity: Tribes in India", Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 13, (March 26–April 1, 2005), pp. 1363-1370. (Available at https:// www.jstor.org/stable/4416402)

53. Amita Baviskar, 'Adivasi Encounters with Hindu Nationalism in MP', Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 48, (November 26 – December 2, 2005), pp. 5105-5113.

54. John Hughes Morris, The History of the Welsh Calvinistic Methodists' Foreign Mission: To the End of the Year 1904, M. L. Gidwani, Indus Publishing Company, New Delhi, 1996, p. 90.

55. (NPE 1986) Govt. of India, Ministry of Education, National Policy on Education 1986, New Delhi, pp. 14, 17, 25, 36, 128, 175-176, 182, 187; (NEP 2020) Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, National Education Policy 2020, New Delhi, pp. 7-11, 13, 16, 20-21, 25, 27, 33, 42, 52, 54-55.

56. Boro Baski, 'Teaching Santal Children', https://www.dandc.eu/en/article/long-term-success-non-formal-adivasi-school-west-bengal; P. Nair, "Whose Public Action? Analyzing Inter-sectoral Collaboration for Service Delivery: Identification of Programmes for Study in India." International Development Department, Economic and Social Research Council, February 2007; A.K. Dandapat and S. Manna, Present Scenario of Inclusive Education of Tribal Society in India, Indian Journal of Applied Research, Vol. 9, No. 6, 2019, pp. 6-9.

57. Pradip Chattopadhyay, Redefining Tribal Identity: The Changing Identity of the Santhals in South-West Bengal, Primus Books, Delhi, 2014, pp. 145-147.

58. Hansda Sowvendra Shekhar, The Adivasi Will Not Dance, Speaking Tiger, New Delhi, 2015.

58. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬০; Ranajit Guha, 'The Prose of Counter-Insurgency', Subaltern Studies, No. 2, Writings on South Asian History and Society, Ranajit Guha (ed.), Oxford University Press, Delhi, 1983, pp. 1-42; তরুণদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শনঃ পুরুলিয়া, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৬; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা, ১৯৭০; Ananda Bhattacharya (ed.), Adivasi Resistance in Colonial India: Comprising the Chuar Rebellion of 1799 by J.C. Price and Relevant Midnapore District Collectorate Records from the Eighteenth Century, Manohar, New Delhi, 2017.